KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M T AMER LANE, KOLKATA-700009

Accd No : KLMLGK 2007	Place of Publication 28 চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬
Collection KLMLGK	Publisher আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title সমকালীন (SAMAKALIN)	Size 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number ২৬/- ২৬/- ২৬/-	Year of Publication বৈশাখ ১৩৮৫ ।। April-May 1978 শ্রাবণ ১৩৮৫ ।। Aug 1978 কার্তিক ১৩৮৫ ।। Nov 1978 Condition Brittle Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C D Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের পত্রিকা

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

ষষ্ঠবিংশ বর্ষ ॥ কার্তিক ১৩৮৫

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

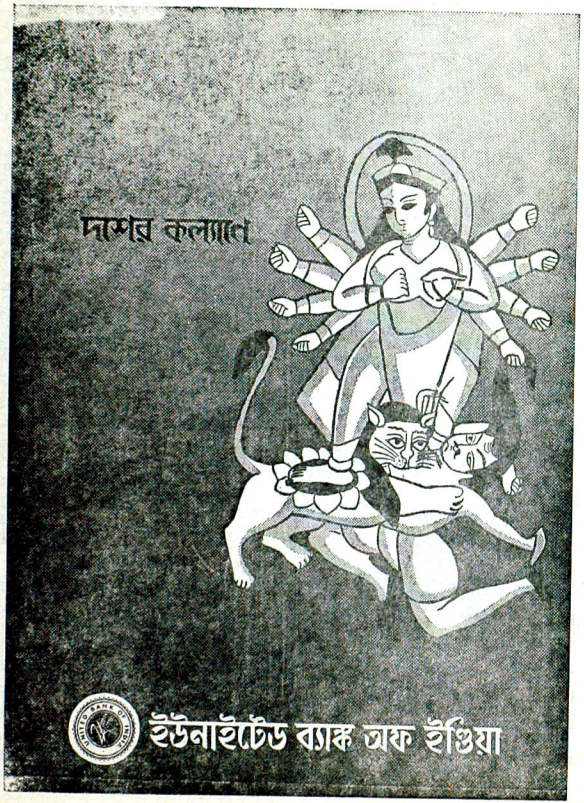

ষষ্ঠবিংশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা   কার্তিক তেরশ' পঁচাশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের পত্রিকা

সূচীপত্র

আবরণ প্রসঙ্গে । কনককান্তি বসু ৮১

বাংলার গঙ্গা—জল বাণিজ্য । অশোককুমার বসু ৯০

রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অমিয়নাথ । নরেন্দ্রকুমার মিত্র ১০০

অরুণাচলের আদিভাষা ও সংস্কৃতি । কমলেশ দাশগুপ্ত ১০৩

সমালোচনা : তেলিয়াগড়ীর প্রাঙ্গণে ॥ প্রকাশ পাল ১১১

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক সুশীল প্রিণ্টার্স ২ ঈশ্বর মিল বাই লেন,
কলি-৬ হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলি-১৩ হইতে প্রকাশিত

HINDUSTAN MOTORS LIMITED

Manufacturers of
Ambassador Car, Truck, Trekker and Heavy Earthmoving Equipment

Registered Office :
9/1, R. N. Mukherjee Road, Calcutta 700 001

Factories at :
Hindmotor (West Bengal) and Trivellore (Tamil Nadu)

সমকালীন

বর্ষ ২৬ কার্তিক ১৩৮৫

আবরণ প্রসঙ্গে

কনককান্তি বসু

সভ্যতার আদিতম পর্বে যে যে সামগ্রীর অন্বেষণ ও উদ্ভাবন অত্যন্ত জরুরী বলে তৎকালীন মানুষের কাছে প্রতিভাত হয়েছিল আবরণ নিঃসন্দেহে তার অন্যতম। আবরণ অন্বেষার প্রাথমিক যুগে গাছের ছাল সাময়িক সান্ত্বনার কারণ হলেও মানুষকে দীর্ঘদিন নিশ্চেষ্ট রাখার পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না। ভিন্ন ক্ষেত্রে সামান্য উন্নতির সংগে সংগে মানুষের অংগ থেকে খসে পড়ল বল্কল বা ছাল। এবার এল জন্তু-জানোয়ারের চামড়া। এখানেও থেমে পড়েনি আবরণ ভাবনা। লজ্জা নিবারণ, সৌন্দর্য-সাধন এবং নির্মম প্রকৃতির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য নতুন নতুন ভাবনার ফলে সৃষ্টি হল নতুন নতুন আবরণ। ভারতবর্ষে প্রাচীনতম সভ্যতার যে নিদর্শন সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া গেল সেখানে একটি বস্ত্রখণ্ড প্রমাণ করল যে তুলা-পশমের ব্যবহার ঐ দূর অতীতের মানুষের কাছেও অজ্ঞাত ছিল না। আসলে নবাশ্মীয় যুগ থেকে বয়নের অস্তিত্ব আজ স্বীকৃত সত্য।

বকের মত বসে
হাত পা তার নাড়ানাড়ি
উল্টা-পাল্টা চষে।
এক জীব তার জলে লাগায়
অন্য জীবে পোষে॥

* * *

ভোঁ ভোঁ করে তোমরা নয়
গলায় পৈতা বামন নয়॥

* * *

নালার পাখী নালায় ঘুরে
ঘুরে ঘুরে তার পেট ভরে।
বড় বড় বিলে সাঁ সাঁ উড়ে
জীব নয়, জন্তু নয়, মানুষ গেলে।

* * *

হাত আছে তার মাথা নেই
পেট ঝলমল করে
বাঘ নয় ভালুক নয়
আস্ত মানুষ গেলে।

তাঁত, মাকু, তক্‌লি, কাপড় ও জামা সংক্রান্ত এই ধরণের ধাঁধা, প্রবচন প্রভৃতির সংখ্যার অন্ত নেই। আমাদের দেশে অন্ততঃ তিন হাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়ে যে কারুশিল্প বেঁচে আছে তার খুঁটিনাটি নিয়ে এই জগতের সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। সিন্ধুসভ্যতার পরে বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন পর্বে আবরণ সম্পর্কিত নানা তথ্য আমরা পাই। ঋগ্বেদে বহিরাবরণ হিসাবে অধিবস্ত্রের উল্লেখ বর্তমান। কুবীর এবং প্রতিধি পরিচ্ছদ হিসাবে সেখানে বর্ণিত হয়েছে। তখন পোষাকপরিচ্ছদ তৈরী হত সুতো ও পশম দিয়ে। যজুর্বেদে পেশকারী বা চুঁচের কাজের কথা বলা হয়েছে। অথর্ববেদে কুবীর ছাড়া নাবি, উপবাসন, বস্ত্রি, উষ্ণীষ, কষ এবং তিরিটের উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বোনা এবং সেলাই নিয়ে বলতে গিয়ে জানানো হয়েছে যে, তুলো, পশম এবং রেশম থেকে পোষাক প্রস্তুত করা হত। বাস, অধিবাস এবং নাবি এই তিন রকমের পোষাক তখন প্রচলিত ছিল। ছাত্রেরা কৃষ্ণাজিন বা কালো হরিণের ছাল দেহাবরণ হিসাবে ব্যবহার করত। কল্পসূত্র থেকেও কারুশিল্পী হিসাবে তাঁতীর কথা পাওয়া যায়। এই সময়ে তার্প্য ও পাণ্ড নামে দুই শ্রেণীর বস্ত্রের কথা জানা যায়। তাছাড়া পশমে তৈরী শ্যামুল আচ্ছাদনের কথা আমরা জানতে পারি। পাহাড়ী ছাগলের লোমে তৈরী হত কুতপ। পাণিনিও তাঁতীর কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে কৌশেয় (রেশম) ঊর্ণ (পশম), উমা, ভঙ্গ, কার্পাস বস্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ করতে ভোলেন নি। পাণিনির মতে পোষাক হচ্ছে তিন রকম : এক, অন্তরীয়—অর্থাৎ গায়ের সঙ্গে লেগে থাকা আবরণ; দুই, প্রাবার—অর্থাৎ চাদর বা আলোয়ান; তিন, বৃহতিক—কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেওয়া বস্ত্রখণ্ড। এছাড়া রাম্ভব নামে এক বিশিষ্ট জাতের চাদরের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। রামায়ণে বিছানা, আসন প্রভৃতি ঢাকা দেবার জন্য হরিণ, বাঘ ও সিংহের চামড়া প্রভৃতি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। জীবিকার জন্য যে সব বৃত্তির কথা বলা হয়েছে তাতে বয়নের গুরুত্ব সহজে নজরে আসে। তখনকার দর্জিরা তুন্নবায় নামে আখ্যাত ছিল। আবরণ নিয়ে সভ্যতার যে জয়যাত্রা অন্ধকারময় যুগে সুরু হয়েছিল মধ্যযুগে এসে তা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের নামে বহুধাবিভক্ত হয় এবং বিংশ শতকের শেষ পর্বে এসে আবার আন্তর্জাতিক রুচি সেই মধ্যযুগীয় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে এক নিখিল বিশ্ব আবরণ রুচির দিকে ধাবমান হয়। বলা বাহুল্য, এই আন্তর্জাতিকতা দেশ বা অঞ্চলবিশেষের প্রাকৃতিক অর্থাৎ ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাকে

স্বীকার করেই এগিয়ে চলেছে।

বস্ত্রখণ্ডের জন্মের সংগে যে যান্ত্রিক প্রয়াস ওতপ্রোত তা হল তাঁত। যুগে যুগে এই তাঁতের বিবিধ সংযোজন ও পরিবর্তন ঘটেছে ও ঘটছে। বলা বাহুল্য, এই পরিবর্তনের সংগে মানুষের আবরণ সম্পর্কিত অভিরুচিও জড়িয়ে ছিল এবং আছে। প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগে তাঁতের জন্ম। তন্ত্র অর্থে তাঁত হলেও ব্যবহারিক অর্থ যা দাঁড়িয়েছে তাতে তন্ত্র বয়ন করা হয় যে যন্ত্রে তাই হল তাঁত। ভারতবর্ষ থেকে তাঁত অন্যত্র গেছে এ অভিমত অনেকেই পোষণ করেন। (১) ঋগ্বেদে বস্ত্রবয়নের উল্লেখ বর্তমান। (২) মনুসংহিতায় তাঁতির জীবনযাত্রার রীতিপ্রকৃতির উল্লেখ আছে। (৩) কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে সুতো কাটা এবং বস্ত্রবয়নের তত্ত্বাবধানের জন্য রাষ্ট্রকর্তৃক তাঁত-তত্ত্বাবধায়কের নিয়োগের কথা বলেছেন।

শানা, মাকু, দক্তি ও নরাজ নিয়ে তাঁতে কাপড় বোনা হয়। কাপড় বোনা হয় লম্বালম্বি, যাকে বলা হয় টানা এবং আড়াআড়ি বা পোড়েন। প্রথমেই শানার কথা বলার প্রয়োজন। শানার কাজ হল টানা সুতোর প্রেইগুলোকে পরস্পর নিজের নিজের জায়গায় রেখে টানাকে নির্দিষ্ট প্রস্থ অনুযায়ী ছড়িয়ে রাখা। শানার সাহায্যে কাপড় বোনবার সময় প্রত্যেকটা পোড়েনকে আঘাত দিয়ে পর পর বসানো হয়। এরপর হল মাকু। যে কাঠের বা লোহার কাঠামোর মধ্যে নলি ভর্তি পোড়েনের সুতো পরানো হয় তাকে মাকু বলে। মাকুর কাজ হল টানার সুতোর ভিতর দিয়ে পোড়েনের সুতো চালানো। তিন হল দক্তি। একটা ভারি সোজা চওড়া কাঠে নালি কেটে শানা বসানো হয় আর তার পাশ দিয়ে কাঠের ওপর দিয়ে মাকু যাতায়াত করে। শানাকে ঠিক জায়গায় রাখার জন্য ওর ওপরে চাপা দেবার যে নালি কাটা কাঠ বসানো হয় তাকে মুঠ-কাঠ বলে। শানা ধরে এই দুটো কাঠ একটা কাঠামোতে আটকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থা তাঁতের যে যন্ত্রাংশ দিয়ে সম্পন্ন হয় তাকে বলা হয় দক্তি। চতুর্থতঃ হল নরাজ। শানায় গাঁথা দরকার মত প্রস্থ অনুযায়ী টানাকে একটা গোল-কাঠের ওপর জড়িয়ে রাখা হয় তাকে বলে টানার নরাজ। তাঁতি যেখানে বসে তাঁত বোনে সেখানে তার কোলে একটা নরাজ থাকে যাকে কোল-নরাজ বলে। টানার নরাজের কাজ হল টানার সুতোকে টেনে ধরে রাখা আর কোল-নরাজের কাজ হল বুনোনির পরে কাপড় গুটিয়ে রাখা।

বোনবার জন্য তাঁতে সুতো জোড়বার আগে টানা হাটা, শানা গাঁথা এবং টানা নরাজে পৌঁচানোর কাজ করে নিতে হয়। এছাড়া যে কাজটি থাকে তা হল 'ঝ' গাঁথা। টানা পৌঁচাবার পর ওর প্রত্যেকটা থেইকে 'ঝ'-এর সুতো দিয়ে গেঁথে নিতে হয়। এর ব্যাপার হল, নকশা অনুযায়ী বোনবার জন্য টানার সুতোকে পর পর ওপর নীচ রাখার ব্যবস্থা করা পোড়েনের সুতো যাতে ভেতর দিয়ে যেতে পারে। 'ঝ' তোলা বা গাঁথা শেষ হলে টানার নরাজ কোল-নরাজ থেকে খানিক ঢালু করে তাঁতের কাঠামোতে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। এইবার সুরু হল বয়ন কাজ। বয়নক্রিয়া তিন রকমের। (১) ঝাঁপ করা; (২) মাকুমারা; (৩) ঘা-মারা। ঝাঁপকরা : ঘা করলে টানার সুতো ওপর নিচ দু-ভাগে ফাঁক করে পোড়েন ভর্তি মাকু যাবার রাস্তা তৈরী হয় তাকে বলে ঝাঁপকরা। মাকুমারা : টানার সুতোয় প্রয়োজন মত ঝাঁপ করে ওর ভেতর দিয়ে পোড়েন চালাবার কাজের নাম মাকুমারা।

ঘা মারা : এক একটি পোড়েন চালানোর পর তাকে শলা বসানো দক্তি দিয়ে ঘা দিয়ে ঠাস করে বসানোকে ঘা মারা বলে। মুঠ-কাঠ হাতে ধরে পোড়েনে ঘা মারতে হয়।

সুতো নিয়েই তাঁতের যা কিছু কাজ-কববার। সুতোর জন্মের সংগে যে বস্তু চিরকাল জড়ানো তাকে বলা হয় তন্তু। তন্তু হল দু'রকমের। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম। প্রাকৃতিক তন্তু আবার প্রাণীজ ও উদ্ভিজ। প্রাণীজ তন্তু—রেশম, পশম ইত্যাদি। উদ্ভিজ তন্তু—বীজ থেকে (কার্পাস) ছাল থেকে (পাট, নারকেল, সুপারী) পাতা থেকে (শন)। কৃত্রিম তন্তু আবার প্রাণীজাত যেমন কেসিন বা জীন, কোষজাত যেমন রেয়ন। খনিজজাত যেমন ফাইবার গ্লাস। কৃত্রিম রঞ্জন থেকে পলিমার নামের অনেকধরণের তন্তু তৈরী হয়। যেমন নাইলন, ডেক্রন, অরলন, ভিনিয়ন ইত্যাদি। গুটিপোকা থেকে যে সুতো তৈরী হয় তাকে বলে রেশম বস্ত্র। এই গুটিপোকা নাগ, বকুল, বট ও লিচু এই চার রকমের গাছে জন্মায়। নাগগাছের কৃমি পীতবর্ণ, লিচু গাছের কৃমি ধূসর বর্ণের মত। বকুলগাছের কৃমি শ্বেতবর্ণের এবং বটগাছের কৃমি মাখনের মত এই সমস্ত কৃমির মধ্যে সুবর্ণকুণ্ড দেশের কৃমিই শ্রেষ্ঠ। কৌটিল্য সুতোর গুণাগুণ নির্দিষ্ট না করে সংক্ষেপে বলেছেন কোন্ কোন্ দেশের কার্পাস বস্ত্র শ্রেষ্ঠ। তিনি উল্লেখ করেছেন মধুরা (সম্ভবত মথুরা) কলিঙ্গ, কাশী, বংগ, মহিষ দেশের কার্পাস বস্ত্র শ্রেষ্ঠ। গোভিল গৃহ্যসূত্রে ব্রহ্মচর্যাবস্থায় চার রকম বস্ত্র ব্যবহারের কথা বলেছেন। (১) ক্ষৌম (২) শান (৩) কার্পাস (৪) ঔর্ণ। ব্রাহ্মণের জন্য ক্ষৌম অথবা শান, ক্ষত্রিয়ের জন্য কার্পাস এবং বৈশ্যের পক্ষে আবিক বা ঔর্ণ। ক্ষুমা বা অতসী গাছের ছাল থেকে সংগৃহীত সুতোর নাম ক্ষৌম। কৌশেয় পট্টবস্ত্র নামে অভিহিত হয়ে থাকে অর্থাৎ পাট থেকে উৎপন্ন বস্ত্র। লোম থেকে প্রস্তুত বস্ত্রের নাম ঔর্ণ এবং তুলা থেকে প্রস্তুত কাপড়ের নাম কার্পাস। যুক্তিকল্পতরুতে গুটিপোকানুসারে পরিধান বস্ত্রকে শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। বস্ত্রকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যও শূদ্র এই চারি ভাগ করা হয়েছে। পরিধান বস্ত্র প্রসঙ্গে সূক্ষ্ম, ঈষৎ সূক্ষ্ম, মৃদু ও স্থূল এই চার রকমের কথা বলা হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, বস্ত্র শিল্পের প্রচলন ঘটেছে অন্তত নবাশ্মীয় পর্ব থেকে চার হাজার বছর আগে মিশর এবং চীনে বস্ত্রবয়ন বেশ উন্নত পর্যায়ে ছিল। তখনকার দিনে ব্যবহৃত বস্ত্রের রঞ্জন-নৈপুণ্য আজও বিস্ময়কর। চীনদেশে হান্ রাজত্বকালে ২০০ সুতোর অতি সূক্ষ্ম কাপড় পাওয়া গেছে। হুনান প্রদেশে চাংশা থেকে সিল্কের উপর বিভিন্ন রংয়ের কাজ করা কাপড় উদ্ধার করা হয়েছে। সিল্কসহ বিভিন্ন জাতের কাপড়ের ওপর বহুরংয়ের জীবজন্তু ও লতাপাতার নক্সা চিত্রিত হয়েছে। পশ্চিমাংশে ও হান্রাজত্বকালে কাপড়ের ওপর বিভিন্ন চিত্র ও নক্সা করা হত এবং মৃতব্যক্তিকে তা পরিয়ে দেওয়া হত। এছাড়া সিল্কের ওপর বিভিন্ন রঙের তৈরী ফেব্রিকের নমুনাও পাওয়া গেছে। সিল্কের কাপড়, মেয়েদের এবং ছেলেদের তৈরী পোষাকের ওপর সোনা ও রুপোর জলকরা কাজের নমুনা সংগৃহীত হয়েছে। পলিক্রোম ও দামস্কা সিল্কের ওপর এমব্রডয়ারীর কাজ তখনকার দিনে চালু ছিল। চীন, মিশর এবং ভারতবর্ষে সেই সময় থেকেই উন্নমানের কাপড় চালু হয় এবং তার বিদেশের বাজারে বেশ কদর হয়। খৃঃ পূঃ দশম শতকে হুনান প্রদেশের চাংশা এলাকার সিল্ক-এর দেশ ও বিদেশে বিশেষ খ্যাতি ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে যে সমস্ত পোষাক পাওয়া গেছে তার মধ্যে সিল্কের পোষাকই বেশী সংগৃহীত হয়েছে এবং সেই সব পোষাকের রং ও

চিত্রিত নক্সা আজও উজ্জ্বল ও তাজা। সিল্কের মোজা, জুতো, হাতের আবরণ পাওয়া গেছে। ১২৮ সি. এম. লম্বা জামার ওজন মাত্র ৪৯ গ্রাম। এর থেকে তখনকার দিনে হুনান অঞ্চলে সিল্কের জনপ্রিয়তা এবং গুণগত উচ্চমানের ব্যাপারটি অনুমান করা চলে। যাবতীয় ভালো জাতের ছবি আঁকা হতো সিল্কের কাপড়ের ওপর এবং কফিন বাক্সের ভেতরে চিত্রিত কাপড় দেওয়া হত। চীনদেশের কাপড় ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রচুর রপ্তানী হত। ভারতবর্ষে চীনা সিল্কের চীনাংশুক নামে খ্যাতি ছিল। এই চীনাংশুকের উল্লেখ পাই কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে। ভারতবর্ষ ছাড়া সিল্কের কাপড় সোবিয়েত রাশিয়ার উজবেক, আফগানিস্থান, ইরাণ, বাগদাদ, সিরিয়া, তুর্কি, লেবানান পর্যন্ত রপ্তানী করা হত। তাছাড়া জাভা, সুমাত্রা, বালি এবং ইন্দোনেশীয়ায় চীনা কাপড়ের প্রচলন দেখা গেছে। চাংগাং থেকে কংহু এবং দক্ষিণ সিংকিয়াং-এর রাস্তা সিল্ক রোড নামে আজো পুরানো স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রাচীনকালে মিশর এবং আয়ারল্যাণ্ডে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট রংয়ের ব্যবহার প্রচলন ছিল। আইরিশ রাজা ইকেদের আদেশবলে এক রংয়ের জামা পরত ক্রীতদাস, দুই রংয়ের জামা নির্দিষ্ট ছিল সৈনিকের জন্য, তিন রংয়ের জামা ব্যবহার করত সমাজের সম্ভ্রান্ত শ্রেণী। ছয় রংয়ের পোষাক ছিল শিক্ষকের জন্য এবং সাত রংয়ের পোষাক ব্যবহার করার অধিকার ছিল রাজারাণীর। রং ব্যবহারের কিছু কিছু বাধানিষেধও ছিল চীন, রোম এবং মিশরে। ভারতবর্ষ থেকে সুতিবস্ত্রের শিল্পকলা তৎকালে তুর্কিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পারস্য, বার্মা, সিংহল, কম্বোডিয়া, মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বালি শুদ্ধাতেও নিজস্ব দেশীয় গাছের ছাল, ভেড়ার লোম প্রভৃতি সামগ্রী দিয়ে উন্নত মানের পোষাক কাপড়, আলোয়ান প্রভৃতি তৈরী হত। ভারতীয় পাতোলা সিল্কের কদর এই সমস্ত দেশে ছিল। পাতোলা সিল্কের মত বালিতে ছিল ইক্ত সিল্কের সমাদর। বঙ্গের নামের সাধারণত উৎপাদন কেন্দ্রের নামানুসারেই প্রচলন ঘটে এবং কিছুকাল অতিক্রান্ত হলে জায়গার নামেই বস্ত্রের নাম চালু হয়। যেমন বাগদাদ থেকে বাদুকিন, দামাস্কা থেকে দামাস্ক সিল্ক, চীনের সাতুং থেকে সাটিন, কালিকট থেকে ক্যালিকো, বাগদাদের তফেতা পাঞ্জাবে এসে সিল্ক বা সুতির কোঁচকানো কাপড়ের নাম হল তফ্তা, পরবর্তীকালে পারস্যে এণ্ডলি বাফ্তা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এছাড়া কেমব্রিক থেকে কেমব্রিক, সারসেন থেকে সার্জেট, নানকিং থেকে নানকিন, গাজা থেকে গজ, জেন থেকে জী নামের কাপড় আজো চালু আছে। মসৌল থেকে এসেছে মসলিন নাম। মসলিন ব্যবসায়ীদের বলা হত মোসোলিন। আরবদেশে মসলিন কাপড়কে বলা হত মৌসিলি। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায়, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় সোনা ও বিভিন্ন ধাতুর অলংকার ও পাথর এবং মূল্যবান বস্তুর সংগে সূক্ষ্ম মসলিন কাপড়ও লুণ্ঠনের হাত থেকে রেহাই পায়নি। সূক্ষ্ম তন্তু ভারত থেকে অসিরিয়া, মিশর এবং ফিনিসিয়া থেকে দক্ষিণ ইয়োরোপে গিয়েছিল এমন প্রমাণ আছে।

নীশার, নীচোল, বহ্নি-শৌচ বস্ত্র, কনকুকা, কনকোলিকা, অঙ্গীকা, কোলক, কোল, কার্পাসিক, অধিকাঙ্গ প্রভৃতি কাপড় ভারতীয় নারী-মহলে বেশ সমাদর লাভ করেছিল। আর্য মুনি-ঋষিদের পরিধেয় কাপড়ের নাম ছিল 'আহত'। আহত পবিত্রতা ও শুচিতার জন্য পরিচিত

ছিল। 'সন্মাহ' কাপড় পুরুষদের পরিধেয় ছিল। ঋতু পরিবর্তনের সংগে সংগে গাত্র পরিধান কাপড়ের পরিবর্তন ঘটেছে। শীতপ্রধান অঞ্চলে গরম কাপড়ের ব্যবহার নজরে আসে। শরৎকালে পাতলা কাপড়, গ্রীষ্মকালে অতি মিহি কাপড়ের ব্যবহার হয়ে থাকে। বর্ষাকালে ব্যবহৃত কাপড়ের নাম বার্ষিক ও হেমন্তকালে হৈমন কাপড়ের রেওয়াজ ছিল। কিন্তু সিল্ক এবং তসর সমস্ত ঋতুতেই ব্যবহার করা হত। বর্তমানে তসর শুচিতা ও পবিত্রতার লক্ষণ বলে সমাজে সমাদর পেয়েছে বেশী। অতীতে সূতিকাপড় থাকতে তসর পরিধান করত না। তসর ব্যবহার শাস্ত্রবিরুদ্ধ ছিল এবং তসর পরিধান করে কোন শুভ কাজ করা যেত না। ব্রাহ্মণের জন্য শুক্লবস্ত্র অথবা পট্টবস্ত্রের ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। যোগীরা ধৌত সূতিকাপড়ের অভাবে শান, ক্ষৌম অথবা আবিক কাপড় ব্যবহার করতেন। পরমধ্যযুগে বাংলাদেশে তসর ব্যাপকভাবে সমাদর লাভ করেছিল। তখন তসর পরিধান জাঁকজমকের চিহ্নস্বরূপ বলে সাহিত্যেও বর্ণিত হয়েছে :

চন্দনে চর্চিত তনু হেন দেখি যেন ভানু
তসর বসন পরিধান।

এক সময়ে সিল্কজাত দ্রব্য সারা পৃথিবীতে প্রসার লাভ করেছিল এবং সমাদৃত হয়েছিল। বিভিন্ন দেশের সিল্ক ভারতে এসেছে এবং ভারত থেকে উৎকৃষ্ট সিল্ক বিদেশে রপ্তানী হত। রাজস্বের বিরাট একটা অংশ এই পথে রাজকোষে জমা পড়ত। বিদেশী দূতদের, ব্যবসায়ীদের ও রাষ্ট্রিয় অতিথিকে ভারতীয় মসলিন দিয়ে তৎকালে সম্মানিত করা হত। বাংলাদেশে সূচিশিল্পের সূক্ষ্ম কাজ জামদানি শাড়ি ও রঙীন শাড়িতে দেখা যায়। জামদানি শাড়ির নক্সা ছুঁচ ও মাকুর সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয়। অতীতে কোন এক পর্বে ভারতীয় মসলিনের নাম ছিল মোনাখি এবং মোটাজাতীয় মসলিনের নাম ছিল খুদাইন্। মোঘল সম্রাটদের সময়ে মসলিন সূক্ষ্মতার চরম শিখরে উঠেছিল। বাদশাহ ঔরংজীব অন্দরমহলে এসেছেন। তিনি দেখা করতে চান কন্যা জেবউন্নিসার সংগে। ধীরে পা ফেলে এসে তিনি জেবউন্নিসার ঘরে ঢুকতে গেলেন। কিন্তু পর্দা সরিয়ে একটু দ্রুত যেন তিনি বাইরে ফিরে এলেন। তাঁর ভারি কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আমি কথা বলতে এসেছি জেবউন, তুমি গায়ে জামা-কাপড় দাও। অপ্রস্তুত কন্যা বললেন, আমি তো বুঝতেই পারছি না বাপজান। আপনি এসেই বেরিয়ে গেলেন তারপর···আমার অপরাধ নেবেন না। অংগে সাত সাতখানা মসলিন জড়িয়েছি আমি।

ডঃ ওয়াইজের দেওয়া তালিকা অনুসারে জেবউন্নিসার গায়ে ছিল মলমল গ্রুপের সরকার আলি। আবরোয়া, তঞ্জেব, সুবনম-সবনম, খাসা, ঝুনা, গঙ্গাজল, এবং তেরিন্দস মলমল খাসের দলে পড়ে। এর মোটার ওপর আছে বাওআফতা বা হাম্মাম, দিমতি, শর্ণ, জঙ্গলখাসা, এবং গলাবন্ধ। ডোরিয়া বা ষ্টাইপের মধ্যে রাজকোট, ঢাকান, পাদশাহীদার, বুটিদার, কাগজী এবং খেলাপাটের নাম বলা যেতে পারে। থোপকাটা, বা চারখাসের দলে নন্দনশাহী, আনার দানা, কবুতরখোপি, শাবুটা, বাছাদার এবং কন্টিদার রয়েছে। মলমলকে রং করে তার ওপর মুগার কাজ কালিদা নামে চলে আসছে। এ দলে চিকন, কটাওবুমি, নৌবাড়ি, ইরদি, আজিজুল্লা এবং সমুদ্র লহর আছে। নয়নসুখ, শাহ, বর্ণাবুটি, চৌবল, মেল, তেড়চা এবং ধুবলীজাল সেই বিখ্যাত জামদানির দলে পড়ে।

দাস্তরায়ের নায়িকারা, যা বুকে করে গেয়ে উঠেছিল, 'আর আমার এ জামদানি এদেশে নাই ইদানীং।' শাড়ির গানে, 'কেঁদে বলে এক নারী, দিদিলো দুঃখ সইতে নারি, আমি কাল কিনেছি কালোকিনারী ষোল টাকা দামে। কেউ বলে মোর, মলমল সুতো অতি সুকোমল, পরলে করে ঝলমল অঙ্গখানি নয়লো। কেউ বলে, মোর খুটিতোলা, সুতো তার টাকা তোলা, রেখেছিলেম করে তোলা আটপহরে নয়লো। কেউ বলে, মোর গোটা দার হায় হায় তার কি বাহার, দেখতে অতি চমৎকার আঁচলা সমুদায় লো।'

অতীতের মানুষ স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী নানা বর্ণের কাপড় ব্যবহার করতেন। অর্জুন বিরাট পুত্রকে আদেশ দিলেন 'হে নর প্রবীর! তুমি আচার্য ও শারম্বতের শুক্লবর্ণ, কর্ণের পীতবর্ণ অশ্বত্থমা ও রাজার নীলবর্ণ বস্ত্র গ্রহণ কর।' কিন্তু আর্যশাস্ত্রে কিছু রংয়ের ব্যবহারের ব্যাপারেবাধা নিষেধ রয়ে গেছে। সধবারা রঙীন কাপড় ব্যবহার করবে। বিধবার পক্ষে রঙীন কাপড় ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল এবং আজো আছে। কুমারীগণ সাদা বস্ত্র পরিধান-যোগ্যা ছিল না। এছাড়া নীলবস্ত্র পরিধান করে দান, ধ্যান, তর্পণ, তপস্যা, বেদপাঠ নিস্ফল হয় যদিও রমণীগণ উৎসবাদি সময়ে ব্যবহার করতে পারতেন। পুরাণে নীলবর্ণের ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল এমন প্রমাণ আছে। তখনকার দিনে কাপড়ের রং তৈরী হত বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান থেকে। গাছের রস, পাতার রস, বিভিন্ন ফুল, মঞ্জিষ্ঠা ও গাছের আঠা প্রভৃতিথারা রং তৈরী হত।

"কাঁথা বা আলপনার সগোত্র না হলেও নক্সার পারিপাট্যে এবং বোনার কৌশলে বাংলার তাঁতের শাড়ী আজও যে তার জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে পেরেছে দীর্ঘদিনের পরিশীলিত অভিজ্ঞতাই রয়েছে তার মূলে! কার্পাস বস্ত্রের জন্য নদীবিধৌত বাংলার আর্দ্র বাতাস নাকি বিশেষ উপোযোগী, অনেকে মনে করেন বাংলাই কার্পাসের জন্মস্থান। তাঁতের টানা আর পোড়েনের ব্যবহার যে ভারতে বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্র থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কার্পাস বস্ত্র কোনদিনই বাংলার মত উৎকর্ষ লাভ করে নাই। মহেঞ্জোদারোর প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এক টুকরো কার্পাস বস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণিত হয়েছে যে ভারতে বহু প্রাচীন কাল থেকেই কার্পাস বস্ত্রের প্রচলন হয়েছিল। এই দেশ থেকে সুদূর অতীতে মিশরে এবং খ্রীষ্ট জন্মের অব্যবহিত পরে রোমে কার্পাস বস্ত্র রপ্তানী হত। অকুণ্ঠভাবে বিদেশীরা ভারতের কার্পাস বস্ত্রের সূক্ষ্মতা এবং বয়ন কৌশলের প্রশংসা করেছেন। পরবর্তী যুগে বাংলার কার্পাস বস্ত্র মুঘল দরবারে অতিশয় আদরের সামগ্রী হয়ে উঠেছিল।' (বাংলার লোকশিল্প, কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়)

আমাদের প্রাচীন কবি মহাকবিদের সাহিত্যে ভারতীয় কাপড়ের ব্যাপক প্রসার ও প্রচলনের কথা সগৌরবে বলা হয়েছে। কালিদাস শকুন্তলার আবরণের কথা বলতে গিয়ে ক্ষৌমবস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। ব্যাসদেও ক্ষৌমবস্ত্র সম্বন্ধে উদাসী ছিলেন না। চণ্ডীদাস নেতে শাড়ির বর্ণনায় বলেছেন —পটনেত বাসপর, গলে রত্নমালা। অথবা—

নেত পরিধান লাসী হাতে মোহারী বাঁশী
সে কৃষ্ণ গেলান্ত গগনে॥

থানকাপড়ে স্বতন্ত্র পাড় লাগানোর নামই নেতে শাড়ি। এই সম্পর্কে লোকবচন :

পাইয়া ইমাম বাড়ী বুনে নেত পাটশাড়ী।

সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র তৈরী হত প্রধানতঃ খুলনা জেলায় সাতক্ষীরা, ২৪ পরগণা, বর্ধমান ও হুগলি জেলায়। অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরী হত নদীয়ার শান্তিপুরে, নওয়াখালী ও চট্টগ্রামে। এছাড়া ঢাকার মসলিন খ্যাতি আজও ছড়িয়ে আছে। মুর্শিদাবাদও সিল্কের জন্য বিশেষ খ্যাত ছিল। সারাইলের তানজিব মসলিন ঢাকাই মসলিনের মত সূক্ষ্ম ছিল। সুধীরকুমার মিত্র হুগলী ও চন্দননগর এলাকার মসলিনের এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। চন্দননগরের যে তেত্রিশ রকম মসলিনের কথা আছে তাতে বুলবুল চশম, আলবাল্লা, সাঙ্গাতী কারেলা প্রভৃতি প্রধান। এগুলি বাংলার পশ্চিম দিককার মলমল শিল্পের অবদান। এখানকার মলমলের কথায় জানা গেল, ঘাসের উপর বিছোন ছিল একখান মলমল। একটি গরু ঘাস খেতে এসে কিছু বুঝতে না পেরে ঘাসের সংগে মলমলও উদরস্থ করে ফেলে। হুগলীর মলমল ঘাস শিরজ তুলো থেকে তৈরী। এখানকার সরকার আলির টানায় ১৯০০ সুতো থাকত। বর্ধমানের অগ্নিফুলী প্রসঙ্গত আলোচ্য। বর্ধমান পরিচিতিতে—"কথিত আছে যে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাঞ্চননগরের বিশিষ্ট বণিক ধুন দত্তের পিতৃশ্রাদ্ধে ইয়োরোপের নানা স্থান হইতে বহু বণিক নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন ও তাঁহাদের প্রত্যেককে একজোড়া অগ্নিফুলী বস্ত্র উপহার দেওয়া হয়। অগ্নিফুলী তখনকার দিনে উৎকৃষ্ট ও মহার্ঘ বস্ত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। ইয়োরোপীয় বণিকগণ কাঞ্চননগরের এই বস্ত্র ক্রয় করিয়া স্বদেশে আমদানী করিত।"

পাগড়ীর এক খণ্ড পেয়েছেন পারস্যের শাহ। পাঠিয়েছেন তাঁর দূত মহম্মদ আলি বেগ। ডিমের মত একটি খোলে নানান্ মণিমুক্তো ভরে ৩০ গজ লম্বা কাপড়। শাহ চ্যাসিফি খুলে সবটা দেখে বললেন, অসম্ভব। এ আমি বিশ্বাস করি না। মানুষ কখনো এ জিনিষ তৈরী করতে পারে না, এ মাকড়সার জালি বা অন্য কিছু। পেরিপ্লাসের গঙ্গীটিকী নানা নাম নিয়ে শেষ পর্যন্ত মসলিনে এসে ঠেকেছিল। আরবের সুলেমান পর্যটক থেকে তাবার্নিয়ের পর্যন্ত সকলের মন হরণ করেছে মসলিন। এই ঐতিহ্যপূর্ণ শিল্প সম্পর্কে রসরাজ ত্রৈলোক্যনাথ বলেছিলেন, সলেমন যখন জেরুজালেমের মাটি কাঁপাচ্ছে, রোমিউলাস যখন রোম নগরী খাড়া করতে ব্যতিব্যস্ত, হারুণ-উল-রসিদ যখন ছদ্মবেশে রাতে বোগদাদের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন তখন আমাদের ঘরে ঘরে দোলনকাঠি দুলছে। সাঙ্গীতী, আধি, কুম্ভিদার তৈরী হয়েছে যাদুদণ্ডে যাদুস্পর্শে।

'মসলিনে নানা রকমের বুটি তুলে তৈরী করা হত রকমারি নকশার সাড়ী যাকে বলা হত জামদানী। জামদানী সাড়ীর সুতা খুব সরু, বুনট অত্যন্ত জমাট ; কিন্তু এই সাড়ীর বিশেষত্ব তার নকশায় আর বুটিতে। জামদানী নকশাগুলি মূলত রেখা ভিত্তিক ; কোথাও জ্যামিতিক, কোথাও গাছ বা লতা পাতাকে সংক্ষিপ্ত আর বাহুল্যহীন করে সাজিয়ে নেওয়া হত। নকশাগুলির বনিয়াদে মূল বর্ণবিন্যাসে এবং হলদে লাল আর সবুজ এই তিনটি বর্ণের প্রাধান্যে কাঁথার নকশার সংগে এই সাড়ীর একটা নিকট ঐক্য দেখা যায়।'

ষোল আনা লোকশিল্প বলে গণ্য করা না গেলেও নকশা আর রঙের বৈচিত্র্যে মুর্শিদাবাদ বালুচরে তৈরী নামকরা রেশমের সাড়ীর কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করে পারা যায় না। এই সাড়ীর

পাড়ে সাধারণ নকশা আর জমিতে নানা আকৃতির বুটি থাকে। কিন্তু এই সাড়ীর বৈশিষ্ট তার আঁচলার নকশায়। এই আঁচলার বিন্যাস চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের মত ; এই ক্ষেত্রের মাঝখানে থাকে সুন্দর গড়নের কল্‌কা ; তার চারিদিকে খোপে খোপে সাজান থাকে নানা বিচিত্র নকশা। (বাংলার লোকশিল্প) মধ্যযুগের বিদেশীদের 'রেহলা' গুলিতে তৎকালীন বাঙালীর পোষাক বা আবরণ সম্পর্কে বেশ কিছু মন্তব্য নজরে পড়ে। আমরা সামান্য দুয়েকটি ছত্র এখানে উদ্ধার করছি। চীনা পর্যটক ফেই-শিন এর বিবরণীতে রয়েছে…'এদেশের পুরুষেরা সুতীর পাগড়ি মাথায় দেয় এবং সাদা রঙের লম্বা সুতীর জামা পরে। মেয়েরা খাটো জামা পরে। তার চারিদিকে সুতী, রেশম বা কিংখাব-এর ওড়না জড়ায়। এছাড়া তিনি লিখেছেন 'এদেশের স্বাভাবিক উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে সূক্ষ্ম বস্ত্র (মসলিন), সা-হল, কম্বল, তু-লো-কিন, নানারকম কাপড়…প্রভৃতির নাম করা যায়। মধ্যযুগের আরেকজন বিদেশী পর্যটক বাঙালীদের সম্পর্কে বলেছেন, 'সাধারণ-স্তরের পুরুষরা খাটো সাদা জামা পরে, সেগুলি উরুর আধখানা অবধি প্রসারিত। এছাড়া এরা পায়জামা পরে এবং মাথায় তিন চার পাক দিয়ে ছোট পাগড়ী জড়ায়।' এইভাবে দেখতে গেলে প্রায় প্রত্যেক পর্যটকের বিবরণীতে আমরা সেকালের আবরণ সম্পর্কে কোন না কোন মন্তব্য খুঁজে পাই।

ভারতবর্ষে আবরণের জন্য বস্ত্রের ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটেছিল প্রাক-মহেঞ্জোদরো যুগ থেকে। রামায়ণ মহাভারত এবং বিভিন্ন গ্রন্থে ভারতীয় পোষাকের উচ্চমানের কথা বারবার বলা হয়েছে। পুরাণে বলা হয়েছে যে তৎকালে ক্ষৌম এবং কৌশেয় বস্ত্র ভদ্র সমাজে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। রামায়ণ-মহাভারত সহ কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে এবং মধ্যযুগের সাহিত্যেও বিভিন্ন পোষাকের বর্ণনা রয়েছে। কৈকেয়ী, কৌশল্যা প্রভৃতি রাজ্ঞী ও রাজমহিলাগণ ক্ষৌমবস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নববধূ সীতাকে মঙ্গলালাপে সম্ভাষণ করেছিল। মহাভারতে বৈদেশিক বাণিজ্যের যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে জানা যায় চীন এবং কম্বোজ থেকে মৃগচর্ম আমদানী হত। কম্বোজ রাজ যুধিষ্ঠিরকে অতি মূল্যবান বস্ত্র উপহার দিয়েছিলেন—এ তথ্য সভাপর্ব থেকে পাওয়া যায়। সিংহল থেকে পাওয়া গিয়েছিল অতি সূক্ষ্ম সুতোর তৈরী সামগ্রী। চীনা সুতোর সূক্ষ্মতার কথা তো প্রাচীন সাহিত্যের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মধ্যযুগের মঙ্গলসাহিত্যে এবং অন্যত্র অসংখ্যবার আবরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পরমধ্যযুগে তুর্কী আক্রমণের পরবর্তীকালে মধ্যপ্রাচীয় আবরণ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এর পরে ইয়োরোপে ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের অন্যান্য স্থানের পোষাক ভারতীয় আবরণ ঐতিহ্যকে মোহাবিষ্ট করেছে। শুধু ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীর সর্বত্র ইয়োরোপীয় পোষাক আঞ্চলিক পোষাককে গ্রাস করে আন্তর্জাতিকতার রূপ দেবার চেষ্টা চলেছে।

ভারতীয় বস্ত্রও এক সময়ে সমস্ত দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল কিন্তু শিল্পযুগে পা ফেলবার সাথে সাথেই হাতের যুগ ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে পড়ল। তার মন্দা আজও চলেছে কিন্তু যখন হাতে বোনার কাপড়ের প্রসঙ্গ আসে তখন ভারতীয় কাপড়ের বাজার মন্দা এমন কথা বলা যায় না।

বাঙ্গালার গঙ্গা—জল বাণিজ্য

অশোককুমার বসু

সব তীর্থ বার বার।
গঙ্গা সাগর একবার॥

পুরাণের ছড়াটিতে তীর্থপথের যদিও কিছুটা বিপদের আভাস রয়েছে, তবুও অতি প্রাচীনকাল থেকে, মাঘ মাসের মকর সংক্রান্তিতে, গঙ্গা ও সাগর সঙ্গমে স্নান করে পুণ্যার্জনের জন্য, সারা ভারত থেকে যাত্রীরা নদীপথে এই তীর্থে ছুটে গেছে পথের বিপদ কষ্টকে কেউ বাধা বলে মনে করেন নি। চর্যাপদেও গঙ্গা সাগরের উল্লেখ রয়েছে—এত্থু সে সুরসরি যমুনা, এত্থু সে গঙ্গা-সাঅরু।

আকবরের রাজত্বকালে "কপালকুণ্ডলা"র নায়ক নবকুমার সাগর-সঙ্গমে যান। এমনিই এক তীর্থযাত্রী গোবিন্দ দত্ত, গঙ্গাসাগর থেকে প্রত্যাগমনের সময়, স্বপ্নে মা কালীর আদেশ পেয়ে গঙ্গার ধারে একটি জায়গায় নেমে পড়েন এবং সেখানকার জঙ্গল পরিষ্কার করে গোবিন্দপুর গ্রামের পত্তন করেন।

যজ্ঞাশ্ব হরণের ব্যাপারে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র, কপিলমুনির কোপানলে ভস্মীভূত হয়। পরে সগরের নাতি ভগীরথ, মা গঙ্গাকে মর্তে নিয়ে আসেন। গঙ্গা সাগরে মিলিত হয়ে ভস্মীভূত দেহগুলি প্লাবিত করেন এবং ভগীরথ পবিত্র সলিলে তর্পণ করে বংশের পাপ মোচন করেন। কেউ কেউ বলেন ভগীরথ নাকি একজন ঔদক বিজ্ঞানী ছিলেন। খাল কেটে, গঙ্গার প্রবাহ ঘুরিয়ে, গঙ্গা অধ্যুষিত উত্তর ভারত ও বৃহৎ ব দ্বীপ সৃষ্টি করেছিলেন।

যাই হ'ক, এতো গেল গঙ্গার প্রান্তসীমায় একটি মাত্র তীর্থস্থানের কথা। একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে এমনি কত শত দেব দেউল, কত সমৃদ্ধ নগর। ভাবলে বিস্ময় জাগে। মনে হয় গঙ্গা যেন ভারতের ধমনী—ইতিহাস ও ঐতিহ্য। যুগ যুগ ধরে গঙ্গার প্রবাহ ভারতকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অথচ বয়স ও দৈর্ঘ বিচারে, পৃথিবীর অনেক নদীর চেয়ে গঙ্গা ছোট (১৫০০ মাইল দীর্ঘ)। মহেঞ্জোদরো ও হারাপ্পার সভ্যতা কালে, গাঙ্গেয় উপত্যকা সুপ্ত ছিল (?) কিন্তু এ আলোচনার আগে, ভারতের জন্মরহস্য নিয়ে সামান্য দু'চার কথা বলা যেতে পারে।

কার্বনিফেরাস কল্পে পৃথিবীর দক্ষিণে,—ব্রেজিল, আফ্রিকার দক্ষিণাংশ ভারতের দক্ষিণাংশ ও উপদ্বীপ এবং অষ্ট্রেলিয়া নিয়ে একটি বিরাট মহাদেশ ছিল। এটিকে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড বলা হয়। কালক্রমে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড ভেঙ্গে গিয়ে যে সব মহাদেশ ও ভূভাগের সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে দক্ষিণ-ভারত একটি। কার্বনিফেরাস কল্পের শেষে বর্তমান হিমালয়ের উত্তরদেশ, চীনের অনেকাংশ, তিব্বত সমুদ্রের প্লাবনে ডুবে যায়। এই লুপ্ত সমুদ্রের নাম টেথিস। টার্শিয়ারি অধিকল্পে, টেথিস সাগরে সঞ্চিত পলল ধীরে চাপ ও ভাঁজ খেয়ে হিমালয়ের জন্ম হয়। হিমালয় ও ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যবর্তী ভূভাগটি তখন ছিল অগভীর উপসাগরের মত। হিমালয় ও দক্ষিণের নদনদীর নদী নিঃসৃত পললে উত্তর ভারত ও গাঙ্গেয় বদ্বীপের সৃষ্টি হয়। ভূত্বক সৃষ্টির আদিপর্বেই ছোটনাগপুরের জন্ম। গণ্ডোয়ানাযুগে

রাণীগঞ্জ, ঝরিয়ার কয়লাস্তরের সৃষ্টি এবং টার্শিয়ারি যুগে (অর্থাৎ বহুলক্ষবছর পরে) হিমালয়ের জন্ম হয়। ভূতত্বীয় সারণী অনুযায়ী গাঙ্গেয় উপত্যকা ও গাঙ্গেয় বদ্বীপের সৃষ্টি সাম্প্রতিক। রাঢ়ভূমের জন্মও এর আগে এবং সে সময়ে বঙ্গোপসাগর দেশের অনেক ভিতরে ছিল।

নিকট অতীতে, শুধু কলকাতার গঙ্গায় কেন, দামোদর, দারুকেশ্বর, বরাকর, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি নদনদীতে জোয়ার-ভাটা খেলতো। সমুদ্রের জল অপসরণের ফলে ও পলল সঞ্চয়ে বাঙ্গালার দক্ষিণে অনেক ভূভাগের সৃষ্টি হয়েছে। নবদ্বীপ, চক্রদ্বীপ (চাকদা), খড়্গ দ্বীপ (খড়দা) ইত্যাদির সম্ভবত এইভাবেই জন্ম। নবমশতাব্দীর কোন মানচিত্রে, হাওড়া ডানকুনি ইত্যাদি এলাকাকে বিস্তীর্ণ জলাভূমি হিসাবে দেখানো হয়েছে। বহুপূর্বে কলকাতার লবণহ্রদ প্রায় বরিশাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কোন কোন পণ্ডিত দৃঢ় মত পোষণ করেন যে গাঙ্গেয় উপত্যকায় বাসোপযোগী স্থান আধুনিক কালে সৃষ্টি হয়েছে।

মহেঞ্জোদরো ও হারাপ্পার সভ্যতার আগে অথবা সমকালীন অন্য কোন সভ্যতা ভারতে ছিল না, একথা আজ আর জোর দিয়ে বলা চলে না। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে, প্রত্নানুসন্ধানের ফলে প্রস্তরাশ্মীয় ও তাম্রাশ্মীয় জীবনধারার নানা ইতিহাস পাওয়া গেছে। বর্দ্ধমান জেলায় অজয় নদীর তীরে, পাণ্ডুরাজার ঢিবি উৎখননে, যে সব নিদর্শন মিলেছে, পুরাতাত্বিকদের মতে, অজয় উপত্যকায় তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকে লৌহ যুগ পর্যন্ত এক সুমহান সভ্যতার বিবর্তন ঘটেছিল। অজয় ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে কাটা খালের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এখানে প্রাপ্ত বহু নিদর্শন পরীক্ষা করে পণ্ডিতরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই সব জায়গা থেকে তাম্রশ্মীয় নাবিকরা গঙ্গার ওপর দিয়েই (কিম্বা তখন সাগর অজয় উপত্যকার নিকটেই ছিল) বিদেশে বাণিজ্য করতে যেতো। তমলুকের নিকটবর্তী স্থান উৎখননে প্রাপ্ত মাটির পাত্রগুলি পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত নিদর্শনের অনুরূপ। এ' ছাড়াও, বর্ধমানের বনকাটি, দামোদরের তীরে বীর ভানুগ্রাম, ডায়মণ্ডহারবারের নিকটস্থ দেউলপোতা, হরিনারায়ণপুর, কলকাতার নিকটস্থ গঙ্গা ও বিদ্যাধরীর সঙ্গমস্থলে, বেড়াচাঁপা (বা চন্দ্রকেতুগড়) আদি গঙ্গার তীরে আটগড়ায়, উন্নত সভ্যতার বহু নিদর্শন মিলেছে। ক্রমাগত অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের এই সব অঞ্চলের সভ্যতা প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগ থেকে লৌহযুগ অতিক্রম করে চলে গেছে। পুরাকালে এসব জায়গার অধিবাসীদের সঙ্গে সুদূর মিশর, ক্রীট ইত্যাদি ভূমধ্যসাগরীয় অধিবাসীদের জলপথে যোগাযোগ ছিল। শুধু তাই নয়, নানা স্থানে বন্দরের অস্তিত্ব ও মিলেছে।

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, পশ্চিমবঙ্গে এই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল, গঙ্গার উভয় তীরে, গঙ্গা ও তার কোন শাখানদীর সঙ্গমস্থলে অথবা গঙ্গার সন্নিকটে কোন শাখানদীর তীরে। শুধু বাঙ্গালায় নয়, হিমালয় নিঃসৃত হয়ে, সমতলে প্রবেশের মুখ থেকে মোহনা পর্যন্ত বহু রাজ্য ও রাজধানী, পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর তীরে গড়ে উঠেছে। রূপনারায়ণের তীরে তাম্রলিপ্ত বন্দরের অস্তিত্ব ব্রোঞ্জ যুগেও ছিল। তবে খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দ থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাম্রলিপ্ত বন্দর হিসাবে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করছিল। বঙ্গোপসাগরের অপসারণের জন্য, সমুদ্রপথ বন্ধ হওয়ায়, তাম্রলিপ্ত অবশ্য পরবর্তীকালে ধ্বংস হয়। পেরিপ্লাস, টলেমি, প্লিনি মেগাস্থিনিস প্রমুখ গ্রীক ঐতিহাসিকরা তাম্রলিপ্তের

প্রশংসা করেছেন। সে যুগে, পৃথিবীতে তাম্রলিপ্তের মত বিরাট বন্দর বড়বেশী ছিল না। নানা পণ্যের, বিশেষত সূক্ষ্ম কাপড়ের বিরাট বাণিজ্য হত এই বন্দরের মাধ্যমে। সুদূর চীন, ইন্দোচীন ইন্দোনেশিয়া, সিংহল ও পশ্চিমের নানা দেশের পণ্যবাহী জাহাজের নিয়মিত আনাগোনা ছিল। গঙ্গাবক্ষে ও পথে ভারতের নানাস্থান থেকে বিবিধ পণ্য, তাম্রলিপ্তে এসে সমুদ্রগামী জাহাজে বিদেশে রপ্তানী হত। ফাহিয়েন, হিউএন্‌সাং, ইৎসিং প্রভৃতি চৈনিক পরিব্রাজকরা, তাম্রলিপ্তের ঐশ্বর্যের উল্লেখ করেছেন। তাম্রলিপ্ত থেকেই বোধিক্রম ও বুদ্ধদও সমুদ্রপথে সিংহলে পাঠানো হয়।

আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৪৮০ অব্দে, গাঙ্গেয় উপত্যকায় নৌবাণিজ্যের জন্য বারাণসীই প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখান থেকেই সমুদ্রগামী জাহাজ মাল বোঝাই করে যাত্রা করত। বারাণসীর পর মৌর্যযুগে পাটলীপুত্র ও বহুকাল পরে চম্পানগর (ভাগলপুর) বন্দর হিসাবে খ্যাত হয়।

খৃঃ পূঃ অব্দে, বঙ্গে গঙ্গারাষ্ট্রগণের রাজত্বকালে গঙ্গার পশ্চিমতীরে গঙ্গানগর একটি প্রসিদ্ধ নগর ও বন্দর ছিল। টলেমী বলেছেন, এই গঙ্গানগর (বা গঙ্গে) গঙ্গার পঞ্চধারায় বিভক্ত হয়ে সাগরে মিলিত হওয়ার, কোন একটি ধারার তীরবর্তী ছিল। কেউ বলেন গঙ্গানগর হল আজকের পাণ্ডুয়া অপর মতে, গাংপুরই গঙ্গানগরের স্মৃতি বহন করে চলেছে। রাণীগঞ্জ ও মোজিয়াতে নৌবন্দরের সন্ধান পাওয়া গেছে। ময়নামতীর গীতিকায় দমদমের গোরক্ষনিবাস সমুদ্র তীরবর্তী স্থান বলে উল্লিখিত হয়েছে। হুগলীজেলায় সিঙ্গুরের নিকট, অধুনা লুপ্তপ্রায় প্রায় থিয়ানদীর তীরে রাজা সিংহবাহুর সিংহপুর নামে রাজধানী ছিল। সম্ভবত সিংহপুর সে সময় গঙ্গার নিকটেই ছিল। সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহ, সাতশো অনুচর নিয়ে, সিংহপুর থেকে নদীপথে সিংহল যাত্রা করেন। বারাকপুরের উত্তরে, লুপ্তপ্রায় মগরার তীরে জাহাজঘাটা গ্রামে বন্দরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। পেরিপ্লাস ও টলেমি, জলপথে ভারতে প্রবেশপথ হিসাবে গঙ্গার উল্লেখ করেছেন। রঘুবংশের রঘু দিগ্বিজয়ের পর, "গঙ্গাস্রোতঃস্তরে" অর্থাৎ গঙ্গার মধ্যবর্তী কোন দ্বীপে জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন।

প্রসঙ্গত, সাগরদ্বীপে বর্তমান কপিলমুনির আশ্রমটি, মহাভারত ও পুরাণ বর্ণিত আশ্রম কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কাহিনী বলে, পূর্বে গঙ্গার মোহনায়, আড়াই হাজার বর্গ মাইল ব্যাপী বহু জনসম্পদ বিশিষ্ট শাকদ্বীপ ছিল। এই শাকদ্বীপেই নাকি বেদব্যাস ও কপিলমুনির আশ্রম ছিল। কোনও চৈনিক পরিব্রাজকের ভ্রমণবৃত্তান্তে কিন্তু এই শাকদ্বীপের উল্লেখ নেই। কোন কোন ঐতিহাসিক, বর্তমান সাগর দ্বীপেই 'গঙ্গে' নগরের অবস্থান ছিল, এরকম মত পোষণ করেন। পূর্ব-ভারতের অনেক দ্বীপপুঞ্জ আগ্নেয়গিরি সম্ভূত। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি আগ্নেয়গিরি আছে। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে, অনেক দ্বীপ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের নানা জায়গায় জলমগ্ন ধ্বংসাবশেষ দেখা গিয়েছে। অনুমিত হয়, গুপ্তযুগে অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্পের ফলে শাকদ্বীপ সাগরে বিলীন হয়। ভারতে এখনো শাকদ্বীপী গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণরা বলেন তাঁদের পূর্বপুরুষ গঙ্গার মোহনার কোন দ্বীপবাসী ছিলেন।

যাই হক, দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে সহজেই বলা যায় পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা, আবহমানকাল ধরে কী ভাবে বাঙ্গালা তথা ভারতকে সমৃদ্ধশালিনী করেছে এবং ভারতীয় সভ্যতার প্রচারের মাধ্যম হয়ে আছে।

পশ্চিমবঙ্গের সীমানায় এসে, গঙ্গা দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। পূর্ব শাখাটির নাম পদ্মা। অন্য শাখাটি মালদহ, মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়ে এসে শাখানদী জলাঙ্গীর সঙ্গে, নবদ্বীপের নিকট মিলিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে একই নদীর তিনটি নাম—গঙ্গা ভাগীরথী ও হুগলী। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত গেরিয়া গ্রাম থেকে জলাঙ্গীর সঙ্গম পর্যন্ত—মাত্র ৩২ কিঃ মিঃ অংশটুকুর নাম ভাগীরথী এবং জলাঙ্গী ও ভাগীরথীর মিলিত স্রোতধারার নাম হুগলী। ভাগীরথী, জলাঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা—তিনটি নদী হুগলীর মাথায় বারিসিঞ্চন করে। হুগলীর গতিপথে অবশ্য আরও অনেক সজীব ও নির্জীব নদী এসে মিশেছে। নবদ্বীপ থেকে মোহনা পর্যন্ত হুগলীর দৈর্ঘ ৩৫০ কিঃ মিঃ। এহেন ভাগীরথী ও হুগলী অধুনা বছরের সব সময়ে নাব্য থাকে না। জলাঙ্গী ও অন্যান্য শাখানদীগুলি, বছরের বেশ কিছুকাল, প্রধান স্রোতধারা থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন থাকে। নাব্যতার সমাধানকল্পে, ফারাক্কায় বাঁধ তৈরী হয়েছে। কিন্তু মাত্র কয়েক শতাব্দী আগেও, মা গঙ্গার এ রকম রুগ্নাবস্থা ছিল না। পদ্মাই ছিল সংকীর্ণ শাখা-নদী মাত্র। ভাগীরথী ও হুগলীই ছিল মূল স্রোতধারা। নদী তখন সারা বছরই নাব্য ছিল।

এই পথেই উত্তর ভারতের বাণিজ্য সাগরে যেতো। শ্রেষ্ঠীরা সুবৃহৎ অর্ণব পোতের বহর নিয়ে গঙ্গাবক্ষে পূর্ব ও পশ্চিম দেশে যাত্রা করত। পুরানো গ্রন্থে পাওয়া যায়, এক রাজপুত্র চম্পানগরী (ভাগলপুর) থেকে নৌবহর নিয়ে, সুবর্ণভূমি (বার্মা অথবা পূর্বভারতীয় কোন দ্বীপ) যাত্রা করেছিল। আর একটি কাহিনীতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মের দুই বণিক পাঁচশো গাড়ী বোঝাই পণ্যে, নৌকা বোঝাই করে, গঙ্গাপথে মগধে পৌঁছেছিল। সে আমলে বহু সদাগর বারাণসী, পাটনা, ভাগলপুর থেকে গঙ্গাবক্ষে সুদূর প্রাচ্য ও পশ্চিম দেশে বাণিজ্য করতে যেত। কোনো কোনো সময়ে, উত্তর ভারতের পণ্য গঙ্গাবক্ষে বাঙ্গালার কোন বন্দরে এসে, সমুদ্রগামী জাহাজে বোঝাই করা হত।

অনেক রাজার, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের রাজাদের সুবৃহৎ নৌবাহিনী ছিল। বাঙ্গালীরা নৌযুদ্ধেও সবিশেষ পটু ছিল। যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াও, গঙ্গাপথে যুগ যুগ ধরে জলবাণিজ্য চলত। ২৪।২৬ দাঁড়ির পাঁচ হাজার মণ-এর নৌকার চলাচল ছিল। বাঙ্গালার নৌবাহিনী বন্দরে বন্দরে পাহারা দিত, শুল্ক আদায় করত। তাম্রলিপ্ত থেকে রেশম, মসলিন, কার্পাস, কাপড়, মরিচ মশলা, গালা, রং, হাতির দাঁতের তৈরী নানা জিনিস, চাল, দড়ি, মণিমুক্তা ইত্যাদি নানা পণ্য জলপথে বিদেশে রপ্তানী হত।

তাম্রলিপ্তর ধ্বংসের পর, গঙ্গা, ময়ূরাক্ষী ও ময়ূরীর সঙ্গমে অবস্থিত, গৌড়বঙ্গের কর্ণসুবর্ণ, বাঙ্গালার সবচেয়ে বড় বাণিজ্যকেন্দ্র হয়। এক সময়ে কর্ণসুবর্ণ থেকে বছরে প্রায় পঞ্চাশটি নৌকায় বিদেশে রেশম তুলো, কাপড় ও অন্যান্য পণ্য রপ্তানি হত। চীন থেকে পারস্য পর্যন্ত বাণিজ্য চলত। গৌড়েশ্বর শশাঙ্কর (৬০০—৬২৫ খৃঃ) মৃত্যুর পর প্রায় একশো বছর, মাৎস্যন্যায় ও আরব জলদস্যুদের অত্যাচারে, বাঙ্গালার নৌ-বাণিজ্য নষ্ট হয়ে যায়। পালবংশের রাজা ধর্মপালের (৭৭০—৮১৫ খৃঃ) রাজত্বকালে, বাঙ্গালার জল-বাণিজ্য কিছুটা চাঙ্গা হয়ে ওঠেছিল। ধর্মপালের "শিলা" নামে অর্ণব-পোতটি ব্রহ্ম, শ্যাম, যবদ্বীপে নিয়মিত যাতায়াত করত। দিল্লী থেকেও গঙ্গা বক্ষে গৌড়ে আসার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আছে যে, শ্রীমন্ত সদাগর একশো গজ দীর্ঘ ও কুড়ি গজ প্রস্থের নৌকায় গঙ্গাবক্ষে পিতার (ধনপতি) অন্বেষণে সিংহল যাত্রা করেন।

পালাগড়ের নিকটে চম্পাইগ্রামে চাঁদসদাগরের বাড়ী ছিল। চাঁদসদাগর বাণিজ্যের জন্য কাঁসাই অঞ্চলে ও গোলাহাটে যাতায়াত করত। সম্ভবত গঙ্গার তীরে গোলাহাট বড় বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। পুরাণো কাব্যে পাওয়া যাচ্ছে—

নবদুর্গা গোলাহাট বামেতে রাখিয়া।
চলিল সাধুর ডিঙ্গা পাটল বাহিয়া॥
.....
গোলাহাট ডিহি গঞ্জ সুরম্য নগরী।
যাহা চাঁদসদাগরের ব্যবসা নগরী॥

হাজার বছর পরে, মোগল আমলে বাঙ্গালার জল-বাণিজ্য হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করে কিন্তু পর্তুগীজ ও মগদস্যুদের অত্যাচারে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়।

তাম্রলিপ্ত ও গৌড়ের গৌরব লুপ্ত হলে, গঙ্গার পশ্চিম তীরে, ১৪শ শতাব্দী থেকে সপ্তগ্রাম (বাঁশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, বন্দেবপুর, নিত্যানন্দপুর শিবপুর, সপ্তচোরা ও বলারঘাটি) বন্দর হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আদি সপ্তগ্রামের টাঁকশাল, শুল্ক গৃহ ও বন্দরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। সপ্তগ্রামের গৌরবকালে ত্রিবেণীর নিকট, পূর্বে তিনটি নদীর (সরস্বতী, যমুনা ও গঙ্গা) সঙ্গম ছিল। সরস্বতী সপ্তগ্রামের গা দিয়ে সাঁকরাইলের নিকটে এসে পুনরায় গঙ্গায় মিলিত হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতেও সরস্বতী সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে নাব্য ছিল। পূর্ব-দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে যমুনা নদী ত্রিবেণীতে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে, ভারতে ইউরোপীয়দের আগমনকালে হুগলী ও অন্য কয়েকটি স্থান বন্দর হিসাবে খ্যাত হলেও, কলকাতাই কালক্রমে গঙ্গার তীরে প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।

১৬৮৮ সালে, "ফকম্" নামে একটি জাহাজ ইংলণ্ড থেকে ৪০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের পণ্য নিয়ে হুগলী বন্দরে আসে। এই উদাহরণ থেকে সেকালে, বন্দর হিসাবে হুগলীর গুরুত্ব বোঝা যায়।

ফরাসী পর্যটক বার্ণিয়ার ১৬৫৮ সালের শেষে সুরাট বন্দরে আসেন এদেশে প্রায় নয় বছর ছিলেন। তিনি বাংলায় দু'বার আসেন এবং তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে, বাঙলার সম্বন্ধে অনেক কিছু বিবরণ রেখে গেছেন। বার্ণিয়ার বলেছেন সে সময়ে, গঙ্গাবক্ষে পাটনা, মস্‌লিপত্তম্ ও করমণ্ডল উপকূলে ধান চালান যেত। এমনকি সিংহল ও মালদ্বীপেও বাঙ্গালা থেকে ধান রপ্তানী হত। এ ছাড়া তুলো, রেশম, মোম, চিনি সোরা ও বিবিধ প্রকার বস্ত্রাদি যথেষ্ট পরিমাণে জলপথেই রপ্তানী হত। পণ্য দ্রব্যের বৈচিত্র্যের জন্য বিদেশীরা বাঙ্গালার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিল। বার্ণিয়ারের মতে, প্রচুর খাল ও শাখানদীর জন্য, নদীপথে মাল যাতায়াতে যথেষ্ট সুবিধা ছিল। গঙ্গার ও অনেক শাখানদীর তীরে বন্দর ও সমৃদ্ধ নগর ছিল। একবার বার্ণিয়ার পিপলিপত্তম্ থেকে নৌকাযোগে হুগলী পৌঁছেছিলেন।

১৪৯৭ সালের শেষে, ভাস্কো-ডা-গামার ভারত ভ্রমণের পর, ইউরোপীয়দের এদেশে আসার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ভারত সোনার দেশ, অফুরন্ত সম্পদ। শুরু হল জলপথে বাণিজ্য, ভারতের উপকূলে ও নদীতীরে কুঠি স্থাপন, কলহ যুদ্ধ বিগ্রহ। বাঙ্গালার গঙ্গা ও অতুলনীয় পণ্য সম্ভার বিদেশীদের টেনে নিয়ে এল। তাম্রলিপ্ত, কর্ণসুবর্ণ, সপ্তগ্রাম চলে গিয়ে, গঙ্গার তীরে নতুন নতুন

বন্দর মাথা তুলে দাঁড়াল। ক্রমে সাতটি জাতি, ব্যাণ্ডেল, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগর ও শ্রীরামপুর বন্দরের অধীশ্বর হল। বাঙ্গালার নবাবের অনুমতি নিয়ে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরীর নিকট হতে সামান্য মূল্যে গোবিন্দপুর, সুতানুটি ও কলিকাতা কিনে কুঠি স্থাপনের পর ১৬৯০ সালে জোব চার্ণকের হাতে কলকাতার জন্ম হল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই কলকাতা বন্দরের মানুষের কাছে অন্যান্যবন্দরগুলি নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। এই সময় থেকেই বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে গঙ্গার নাব্যতা নিয়ে কিছু পরীক্ষা সুরু হয়। কোম্পানীর রিপোর্টে পাওয়া যায়, ১৭৫৮ সালে গঙ্গার সংরক্ষণের জন্য একজন মেরিন সুপারিণ্টেণ্ট নিযুক্ত হয়। সার্ভেয়ার জেনারেল রেণেল (১৭৬৪-৬৫) গঙ্গা জরীপ করেন। ১৭৯৩-৯৭ সালের মধ্যে হুগলী নদীকে কয়েকবার জরীপ করা হয়।

কয়েক শতাব্দী আগে, প্রধান স্রোতধারা (হুগলী নদী) আদিগঙ্গার সঙ্গে মিশে নাগরে চলে গিয়েছিল। কৃত্তিবাসের (১৫শ শতাব্দী) সময়ে আদি গঙ্গা সঙ্কীর্ণ ছিল না। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে বলা হয়েছে চাঁদসদাগর আদি গঙ্গার ওপর দিয়ে সমুদ্র যাত্রা করেন। এর ১৫০ বছর পরে, ক্রকের (১৬৬০) মানচিত্রে আদিগঙ্গাকে দেখানো হলেও, রেণেলের মানচিত্রে (১৭৬৪) আদিগঙ্গার উল্লেখ নেই। বোধ হয় আদিগঙ্গা তখন বুজে যায়। কোন ঐতিহাসিকের মতে আলিবর্দীর শাসনকালে (১৭৪০-৫৬) হুগলীর সোজা দক্ষিণ পথ খোলা হয়। অনেকে বলেন, তিনি গঙ্গার মাটি কেটে খাঁড়ি পথের উন্নয়ন করেন নি, বরং পুরানো পথেই (অর্থাৎ সরস্বতীর মধ্য দিয়ে) নৌ-চলাচলের ব্যবস্থা করেন। ১৭৭৫ সালে, মেজর টলি, কোম্পানীর নিকট হতে, কুড়ি বছরের ইজারা নিয়ে, আদি গঙ্গার সংস্কার করেন। সেই থেকেই এর নাম টলির নালা। টলিসাহেব, এইখানে নৌকাও পণ্য যাতায়াতের ওপর টোল আদায় করে বছরে প্রায় ৪৩০০ টাকা আয় করতেন।

রেল ও স্থলপথের সুযোগ না থাকায়, বাঙ্গালা থেকে যাত্রীরা উত্তর ভারতে এই গঙ্গা পথেই যেতেন। ভূকৈলাসের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৭৯ গঙ্গা পথে প্রয়াগ দর্শনে যান। এমনকি ১৮৩৪ সালে পিতৃদেব "কার টেগর কোং" নামে ষ্টীমারের ব্যবসা করলেও, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১০০৲ টাকায় নৌকা ভাড়া করে গঙ্গা পথে বারাণসী ভ্রমণে যান। উইলিয়াম হিকি ১৭৭৭ সালে, সমুদ্রগামী পালের জাহাজ থেকে সাগরদ্বীপের কাছে নেমে, একটি ছ'দাঁড়ির পান্‌সি চেপে কলকাতা রওনা হন।

কলকাতা থেকে রপ্তানি বৃদ্ধি ও জমিদারী সামলাবার জন্য সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সবিশেষ নজর দেয়। গঙ্গার প্রতিপত্তিও বাড়তে থাকে। ঠিক কবে থেকে গঙ্গায় ষ্টীমার চলাচল সুরু হয়, সেটি বলা কঠিন। তবে নথিপত্রে পাওয়া যায় যে, ১৮১৯ সালে অযোধ্যার নবাব গোমতীতে প্রমোদ বিহারের জন্য একটি ষ্টীমার তৈরী করান। যাই হক, ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত কোম্পানীর গঙ্গায় ষ্টীমার চালাবার একচেটিয়া অধিকার ছিল। ঠিক পরের বছর থেকে, দুটি অন্য প্রতিষ্ঠান, কলকাতা, মির্জাপুর ও এলাহাবাদে স্বতন্ত্রভাবে ষ্টীমার চলাচলের ব্যবসা আরম্ভ করে। ১৮৬৪ সালে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে, দুটি প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়ে ব্যবসা চালাতে বাধ্য হয়। ১৮৮৩ সালে, দি আসাম মেল সার্ভিস চালু হয়। তবুও এইসব কলের জাহাজ আভ্যন্তরীণ নৌ-বাণিজ্যকে আত্মসাৎ করতে পারে নি। সুদূর দিল্লী থেকে সুরু করে আসাম এমনকি নেপালের সীমানা পর্যন্ত গঙ্গাবক্ষে ও অন্যান্য নদীবক্ষে নৌকায় পণ্যের চলাচল অব্যাহত ছিল।

১৮৬০ সালে, কলকাতায় গঙ্গার তীরে চারটি ফ্লু-পাইল জেটি তৈরী হল। ১৮৬৬ সালে বজবজে তেলের জেটি এবং ১৮৯৩ সালে খিদিরপুরের ডক তৈরী হয়।

কাজের সুবিধার জন্য, ইংরাজ সরকার ১৮৩৯-৪২ সালে জি. টি. রোডের সংস্কার করে। ১৮৫৬ সালে কয়লাখনি পর্যন্ত রেলপথ হয় এবং ক্রমে এই পথ বিস্তৃত হয়। ফলে, গঙ্গায় নৌ-বাণিজ্য বিপদগ্রস্ত হল। ১৮৮১ সালেও নদীপথে, কলকাতা থেকে প্রায় ২৭ কোটি টাকার মাল আমদানী রপ্তানী হয়। কিন্তু পরের বছর থেকেই এই বাণিজ্যের ক্রমাবনতি ঘটে। ১৮২৫ থেকে ১৮৫৪ সালের মধ্যে গঙ্গ-যমুনা খাল কাটা হলে, ভাগীরথীতে জলপ্রবাহ যথেষ্ট কমে যায়।

১৭৭৫ সালে, রাণীগঞ্জে প্রথম কয়লা উত্তোলন হলেও, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ও আত্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য, ১৮৪১ সাল থেকেই উত্তোলন ঠিক মত আরম্ভ হয়। বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োজনের ও কলকাতা বন্দর হতে রপ্তানীর জন্য, খনি থেকে কয়লা রেল যোগে সরবরাহ হয়। কয়লা ক্রমে কলকাতা বন্দরের একটি প্রধান রপ্তানী পণ্য হয়। ১৮৯৯ সালে, বন্দর থেকে ১৩ লক্ষ টন কয়লা রপ্তানী হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই, বাঙ্গালায় নৌ-বাণিজ্য কী বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হতে সুরু হল, সেটি ই. আই. রেলওয়ের এঞ্জেন্টের একটি চিঠি থেকেই আন্দাজ করা যেতে পারে। চিঠির তারিখ—১৮/২২শে মে, ১৮৯৯ এবং বিষয়—হাওড়া রেলওয়ে ইয়ার্ডে মালগাড়ীর ভীড়। চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন যে এপ্রিল মাসে ডকে, রেল যোগে ১৪০০০ টন পণ্য (কয়লা ব্যতীত) আসে এবং হাওড়ায় আসে ১লক্ষ টনের বেশী। ১৯০৫ সালে, গঙ্গায় ও বন্দরের কাজের জন্য ১৫,১৯৪টি নৌকার চলাচল ছিল এবং আসাম জলপথে ৪৭, ৮৪৭টি নৌকা ছিল। কিন্তু ১৯০৭ সালে নৌকার সংখ্যা কমে যায়। ১৯১৩—১৪ সালে, পাটনা-কলকাতা নৌ-বাণিজ্য বন্ধ হল ও বাণিজ্য প্রবাহ সম্পূর্ণ ঘুরে গেল। অর্থাৎ রপ্তানি কমে আমদানী বৃদ্ধি পেল।

ভারতের বিপুল জল-বাণিজ্যের ইতিহাস আলোচনা করলে, স্বভাবতই মনে নানা বিষয়ে প্রশ্ন জাগে। যথা, সেকালে নদী ও সমুদ্রগামী নৌকার আয়তন ও গঠন প্রণালী কিরকম ছিল? কি কি ধাতু ও বস্তুর দ্বারা নৌকা নির্মাণ হত? নৌ-বাণিজ্যের জন্য রীতিনীতি, আইন, শুল্ক আদায়ের পদ্ধতি কি রকম ছিল?

এই সমগ্র ব্যাপারে, বিশদ ও ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকলেও নানা ঘটনা ও কিছু শাস্ত্র থেকে অনেক খবর সংগ্রহ করা যেতে পারে। মৌর্যযুগে নদী ও সাগরে নৌ-চলাচল ও শুল্ক আদায় সংক্রান্তব্যাপারে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ছাড়াও বহু স্মৃতি-শাস্ত্রে শুল্ক আদায়, নৌ-বাণিজ্য সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেই, বাণিজ্য জলবাণিজ্য, শুল্ক ও রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে সুচারুরূপে ও বিশদভাবে আলোচনা ও নির্দেশ আছে। এই শাস্ত্রে পণ্যকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। স্থলপথে আমদানী দ্রব্যকে 'ভয়' স্বদেশের পণ্যকে 'অভ্যন্তর ও জলপথে আমদানী দ্রব্যকে "আতিক" বা "প্রবাস্য" বলা হয়েছে। জলবাণিজ্যের প্রধানকে নাবধ্যক্ষ বলা হত। নাবধ্যক্ষ জাহাজের মেরামতির কাজ, দুর্গত জাহাজের সহায়তা, মাল বোঝাই ও খালাসের পরিচালনা করত। এ ছাড়াও, জলদস্যুদের আক্রমণ থেকে বন্দর ও

উপকূল রক্ষণ, বন্দরে আইনভঙ্গকারীর বিচার, সন্দেহজনক ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও বন্দরে আইন শৃঙ্খলার দেখাশোনা নাবধ্যক্ষই করত। দুর্গত জাহাজের জন্য অর্ধেক বন্দর শুল্ক ও ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যের বিনা শুল্ক ব্যবস্থার ভার নাবধ্যক্ষর ওপরই ছিল। সমুদ্রগামী জাহাজের তলদেশ তাম্রমণ্ডিত না করা পর্যন্ত, বন্দর ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ পাওয়া যেত না। ঘাটে ও বন্দরের শুল্কের বিভিন্ন হার ছিল। (বিবাহ দ্রব্য, পূজা দ্রব্য, উপহার দ্রব্য প্রভৃতির উপর কর ছিল না।) অস্ত্র-শস্ত্র, বহুমূল্য মণিমাণিক্য আমদানী নিষিদ্ধ ছিল। নদী ও সাগর তীরবর্তী নগর ও গ্রামে কর আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। নদী পারাপারের সময় মাল অনুযায়ী মাশুল দিতে হত। পরধন, পরস্ত্রী ও পরকন্যা অপহারক ও ব্যাধিগ্রস্তদের নদী-পার হতে দেওয়া হত না। বড় নদীতে ও সমুদ্রগামী নৌকার আয়তন অনুযায়ী, দাঁড়িমাল্লা নিযুক্ত করার নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল। বিদেশ থেকে আনীত পণ্য রাখার জন্য আলাদা গুদামঘর থাকত। নদীর দুইতীরে জলরক্ষীরা নৌ-চলাচলের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখত। বন্দরে বন্দরে শুল্ক আদায়ের সুব্যবস্থা ছিল। মোগল আমলে এইসব নানা কানুনের বাণিজ্যের গতি অনুযায়ী পরিবর্তন হয়েছিল। আইন-ই-আকবরীতে পাওয়া যায় যে সপ্তগ্রাম বন্দরে শুল্ক আদায়ের অফিস ছিল এবং এই বন্দরের জল-বাণিজ্য শুল্ক ও স্থানীয় কর বাবদ বার্ষিক প্রায় ৩৩০০০ টাকা আয় ছিল।

সঠিক কাল নির্ণয় ও লেখকের পরিচয় জানা সম্ভব না হলেও, ভোজরাজের "যুক্তিকল্পতরু" একটি প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থের "নিষ্পাদয়ান" অধ্যায়ে জলযান সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। লোহার নৌকা বা জাহাজ কিছু হাল আমলের নয়। ভোজ লিখেছেন, যে অর্ণব পোতকে সমুদ্রে নিয়ে যেতে হবে, সেটি লৌহ নির্মিত হওয়া আবশ্যক। এই লৌহ হবে কান্ত লৌহ। তবে দীর্ঘকাল সাগরে থাকার নিমিত্ত, তাম্রমণ্ডিত নৌকাই প্রশস্ত। ভোজ নৌকাকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—সামান্যা ও বিশিষ্টা। সামান্যকে ক্ষুদ্রা, ভীমা, চপলা, পত্রপুটা, মন্থরা ইত্যাদি দশটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। সামান্যা নদীতে ও বিশিষ্টা সমুদ্রে যাতায়াতের উপযুক্ত। বিশিষ্টা দু' প্রকার—দীর্ঘা ও উন্নতা। এই দু' প্রকার নৌকাকে পুনরায়, তরণী, লোলা, গভবরা, তরী, জঙ্ঘলা, প্লাবনী, ঊর্ধা, স্বর্ণমুখী গর্ভিণী ইত্যাদি বহু শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক নৌকার জন্য নির্দিষ্ট মাপ আছে। প্রকোষ্ঠের অবস্থান ভেদেও নৌকাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা—সর্ব মন্দিরা, মধ্য মন্দিরা এবং অগ্র মন্দিরা।

আলোচিত নৌ-বাণিজ্য ব্যবস্থা গঙ্গার তীরবর্তী বন্দরেও প্রযোজ্য ছিল ও উপরিউক্ত বিবিধ শ্রেণীর নৌকা গঙ্গায় ও গঙ্গাবক্ষে সাগরে যাতায়াত করত। পাঁচ হাজার, দুহাজার মণী নৌকা গঙ্গা-পথে হামেশাই চলাচল করত। শ্রীমন্তর নৌবহরে—মধুকর, দুর্গাবর, শঙ্খচূড় ইত্যাদি নামে সাতটি অর্ণবপোত ছিল। বিজয় সিংহের অর্ণবপোতে ৭০০ লোকের বাসোপযোগী ব্যবস্থা ছিল।

মালিম, সারেং, টিণ্ডেল, খামালি প্রভৃতি বন্দর ও জাহাজের ছোটবড় কর্মচারীরা, মোগল আমল থেকে আজও আমাদের কাছে ঐ নামেই সুপরিচিত। নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলে, বাঙ্গালায় বাউয়ে নামে এক সাহেব এসেছিলেন। এঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে—পাতেলা (ছ হাজার মণী নৌকা; তলদেশ চেপ্টা), ওলোয়াকো (ছ দাঁড়ির যাত্রীবাহী নৌকা), বজরা, বাজরো (ধনীদের নৌকাবিহারের জন্য নৌকা), পারগুস (মালবাহী) ও বুরসে (সমুদ্রগামী মালবাহী নৌকা) প্রভৃতি কয়েক প্রকার নৌকার উল্লেখ

পাওয়া যায়। ১৮১১ সালে, সল্‌ভিন্স নামে এক ফরাসী শিল্পী, বাঙ্গালায় তৎকালীন ব্যবহৃত কয়েকটি ছোট ও বড় নৌকার ছবি ও বর্ণনা রেখে গেছেন। যথা—পিনেস্ বা ইয়ট্ (পান্‌সি), স্লুনার (সমুদ্র পথে ইউরোপে যাবার যোগ্য ছিল), ব্যাজলস্ (পাঁচ হাজার মণী নৌকা), ব্রিগ্‌স্ (কলকাতা, হুগলী ও উপকূলে চলাচল করত)।

এসব ছাড়াও, স্লুপ, ছিপ, ধুনী, ডড়, গাদা বোট ভাউলিয়া প্রভৃতি অনেক রকমের নৌকার, মোগল থেকে ইংরাজ আমল পর্যন্ত চলন ছিল এবং আজও কয়েকটি এ জাতীয় নৌকাকে গঙ্গায় দেখা যায়। সুরধনী কাব্যে, দীনবন্ধু মিত্র কলকাতার বর্ণনায়, কলের জাহাজের সঙ্গে এসব নৌকার কথাও লিখেছেন। সাত কামরাওয়ালা, দেবী চৌধুরাণীর বজরাখানি অতি মূল্যবান ও নানা বর্ণে চিত্রিত ছিল। চারটি পালতুলে বজরাটি ছুটত। দেবীর ছিপ ছিল ষাট হাত লম্বা ও প্রায় তিন হাত চওড়া। পঞ্চাশটি দাঁড়ি ছিপগুলিকে বিদ্যুৎ গতিতে ছোটাত।

ইংরাজ আমলের গোড়ায়, অনেক ধনী গঙ্গায় পান্‌সিবিহার করতেন। উইলিয়াম হিকি ৪৮ ফুট লম্বা ও ৫ ফুট চওড়া, ১৪ দাঁড়ি মাঝির পান্‌সি তৈরী করান। হিকির বন্ধু রবার্ট পটের পঞ্চাশ দাঁড়ির পান্‌সি ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস একটি ২৬ দাঁড়ির রাজকীয় পান্‌সি তৈরী করান।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই, নৌকার জন্য, প্রধানত কাঠই ব্যবহার হত। বিবিধ কাঠকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র,—এই চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল। শাল, পিয়াল, গাম্ভার, আম, কাঁঠাল বকুল ও চাঁপ কাঠ দিয়ে বিভিন্ন প্রকার নৌকা তৈরী হত। কোম্পানীর আমল থেকে, এ দেশে বর্মার সেগুন কাঠ নৌকা নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। উনবিংশ শতাব্দী থেকে, নৌকার ইতিহাসে লৌহযুগের সূচনা হলেও, আজও কাঠের নৌকা লুপ্ত হয়নি।

নৌকা ও জাহাজ তৈরী ও মেরামতির নির্দিষ্ট স্থানের উল্লেখ প্রাচীনেতিহাসে পাওয়া যায় না। সম্ভবত পুরাকালে, বন্দরের সন্নিকটেই এই সব কাজ হত। ইতিহাসে পাওয়া যায়, রাজা প্রতাপাদিত্য, ধুমঘাট, জাহাজঘাটা ও চাকশ্রীতে জাহাজ মেরামতির জন্য ডক তৈরী করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে শায়েস্তা খাঁ, ক্রত নৌবহর বাড়াবার জন্য হুগলী, যশোহর ও বালেশ্বরে নৌকা ও জাহাজ তৈরীর কারখানা করেছিলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী নৌকা ও জাহাজ তৈরী ও মেরামতির জন্য ডক, কোম্পানীর আমল থেকে তৈরী হয়। অন্তত এ সম্বন্ধে বহু দলিল প্রমাণ মেলে। ১৭৮০ সালে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং কলকাতায় একটি পালের জাহাজ তৈরী করে ১৭৮১ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে ৩৫টি এবং ১৮০১ থেকে ১৮২১ সালের মধ্যে ২৩৭টি জাহাজ কলকাতা ও নিকটস্থ নানা কারখানায় তৈরী হয়। সেকালের মূল্যমানে, খরচ হত টন প্রতি ২০০্ টাকা। ১৭৯০ সালে কোম্পানীর পাইলট জাহাজ তৈরী ও মেরামতির জন্য, ব্যাঙ্কশালে প্রথম ডক তৈরী হল এবং কয়েক বছরের মধ্যেই হাওড়া, শাল্‌কে, খুসুড়িতে ছোট বড় কয়েকটি ডক তৈরী হয়। ১৮০১ সালে, "দি কাউন্টেস্ অভ সাদার ল্যাণ্ড" (১৪৪৫ টন) নামে একটি জাহাজকে ব্যারাকপুর ডক থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভাসানো হয়।

কলকাতা সেই সময় থেকেই বিশ্বে বড় বন্দর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছে। ইংল্যাণ্ডে ও ইউরোপে এখানে তৈরী জাহাজের সুনাম ছড়ায় এবং সেজন্য বহু তর্কের ঝড় ওঠে ফলে বাঙ্গালী জাহাজী

কারিগরদের নানা শাস্তি ও দুর্ভোগ পেতে হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'দশকে, হুগলী নদীর তীরবর্তী বিভিন্ন ডক্ থেকে জাহাজ শিল্পের উৎপাদন মূল্য দু'কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। অবশ্য এ সবই হল কলের জাহাজের আগের কথা।

১৮৩০ সাল পর্যন্ত, ভারতের উপকূলে ও গঙ্গায় পালের জাহাজেই জল-বাণিজ্য চলত। তখন সবেমাত্র পি, এণ্ড, ও, কোং-র দুটি কলের জাহাজ কলকাতা থেকে সুয়েজ পর্যন্ত চলাচল করত। এছাড়া একটি ফরাসী ষ্টীমার, দু'টি চীনা ষ্টীমার ও মুষ্টিমেয় অন্য কয়েকটি ষ্টীমার কলকাতা ও পূর্ব উপকূলে যাতায়াত আরম্ভ করে। ১৮৬৯ সালে সুয়েজখাল খোলার পর ও শিল্প বিপ্লবের ফলে, জাহাজের পরিবর্তে কলের জাহাজ চলাচল বেড়ে গেল। নথিপত্রে পাওয়া যাচ্ছে, ১৮৬১-৬২ সালে কলকাতায় ৮০৩টি পালের জাহাজ ও ৮৯টি ষ্টীমার কাজ করে কিন্তু ১৮৮৯-৯০ সালে ৭৩টি পালের জাহাজ ও ১১২৭টি কলের জাহাজ যাতায়াত করে।

শিল্প বিপ্লবের ফল স্বরূপ, ব্যবসা-বাণিজ্যে আমূল পরিবর্তন হয়। যেটি প্রথমেই নজরে পড়ে, সেটি হল, স্বদেশে বিদেশে ব্যাপকভাবে কল-কারখানা স্থাপন। উনবিংশ শতাব্দী থেকেই বাঙ্গালা ও ভারতের অন্য প্রদেশে কারখানা তৈরীর গোড়াপত্তন ঘটে। রেল ও স্থলপথে পরিবহনের দুর্বলতার জন্য, বন্দরকে কেন্দ্র করেই কারখানা গড়ে ওঠে। সে কারণে কলকাতার নিকটে গঙ্গার তীরে বহু চটকল ও অন্য কারখানা তৈরী হল। মালবাহী নৌকার গুরুত্বও প্রচণ্ডভাবে বেড়ে উঠল। ১৮৩৫ সাল থেকে কলকাতার নিকটস্থ অঞ্চলে নৌ শিল্পের ও ব্যবসার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল এবং কাঠের নৌকার ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠল। বন্দর তখনও ঠিক পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি। বড় জাহাজের মাল বোঝাই ও খালাসের যথেষ্ট অসুবিধা। কাজেই জাহাজের কাজের জন্য নৌকার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। রিপোর্টে পাওয়া যায়, এমনকি ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত গঙ্গাবক্ষে নৌকা থেকে জাহাজে কয়লা বোঝাই হত। তখন বাঁশবেড়িয়া থেকে বজ্‌বজ্ পর্যন্ত নৌকাতে মাল পরিবহন হত। যদিও ইংরেজরাই বেশীর ভাগ নৌকা ব্যবসার মালিক ছিল, তবুও ১৮৯০ সালে এইচ্ এন্ পাল এণ্ড কোং (পরে পল্ এণ্ড চক্রবর্তী কোং) নামে এক বাঙ্গালী সংস্থা নৌকার ব্যবসা শুরু করে। আর্থিক আয়ের এবং নিরাপত্তা ও সুবিধার জন্য, বিংশ শতাব্দী থেকে নৌ-শিল্পে লোহার নৌকার প্রচলন এক নতুন জোয়ার আনে। তবু আজও কলকাতা বন্দরে ভাউলিয়া, নুনের ডড় প্রভৃতি নৌকাগুলি কাঠেরই হয়।

মানুষের সংগে নদ-নদী, জল, জলযানের একটি অঙ্গাঙ্গীভাব সুদূর অতীত থেকে একই রোমাঞ্চকর শিহরণ নিয়ে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে মোড়া—যা সভ্যতার ক্রমবিকাশে চিরদিন যুগিয়েছে শক্তি, সাহস ও স্বাচ্ছন্দ্য। বাণিজ্যিক ব্যবহারিক উপযোগিতার নিরিখে পৃথিবীর অনেক নদনদীর নামই মানচিত্রে মোটা দাগে চিহ্নিত, কিন্তু ইহলোক-পরলোকের আত্মিক ধ্যান-ধারণায় বা পরমার্থিক ভাব সাধনার জগতে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার যে পুণ্যদকারী ভাবচ্ছবিটি বহুকাল ধরে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর হৃদয়ের মণিকোঠায় অঙ্কিত ও রক্ষিত হয়ে আসছে, তার সংগে নিঃসন্দেহে, অন্য কোন নদ-নদীর তুলনা হয় না।

রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অমিয়নাথ

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

'সমকালীন' পত্রিকার পাঠক ইতিমধ্যেই সঙ্গীত সাধক শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল মহাশয়ের সঙ্গীত বিষয়ে বৈঠকী গল্পের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। এই সমস্ত গল্প ছিল বড় বড় গানের ওস্তাদ ও সমঝদারদের ঘরোয়া বৈঠককে কেন্দ্র করে। সান্যাল মহাশয় ওস্তাদদের 'মহিফেল'-এ বা গুরুজীর বৈঠকে যা কিছু হীরা জহরৎ পাকা জহরীর মত চিনে বেছে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন সেইগুলি তিনি তাঁর স্মৃতির ঝুলি থেকে সহৃদয় পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন।

উত্তরকালে সান্যাল মহাশয় নিজেই কয়েকটি গান বাজনার আড্ডার মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করতেন। এর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল বালীগঞ্জে শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ীতে প্রতি শুক্রবার ও শনিবার সন্ধ্যায় এবং কৃষ্ণনগরে তাঁর নিজের বৈঠকখানায় প্রতি সন্ধ্যার বৈঠক। এই শেষোক্ত বৈঠকের দৈনিক সান্ধ্য আড্ডায় কিছু স্থানীয় ওস্তাদদের আগমন হলেও সেই সঙ্গে কিছু সঙ্গীত রসিক ও কলা রসিকদের শুভাগমন ঘটত। এরমধ্যে স্থানীয় কিছু ভদ্রগণ ও কলেজের প্রফেসর ছাড়া আমাদের মত কলেজের কিছু অপোগণ্ড ছোকরাদেরও অবাধ গতিবিধি ছিল এইখানে। এই সমস্ত বিভিন্ন পালকওয়ালাদের একত্র সমাবেশের ফলে আড্ডার মধ্যে প্রচুর বৈচিত্র্যের আমদানী হত। এবং কথা প্রসঙ্গে প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতমগ্নতা সম্পর্কে অমিয়নাথের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ হয়ে পড়ত।

এই ধরণের একটি আলোচনাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের গান 'আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা' প্রসঙ্গে সুরকার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অমিয়নাথের একটি সাধারণ মতামত 'সমকালীন'-এর বৈশাখ ১৩৮৫ সংখ্যায় 'সঙ্গীত সাধক অমিয়নাথ সান্যাল' প্রবন্ধে ব্যক্ত করা হয়েছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে এ পর্যন্ত অনেকে গবেষণামূলক বই লিখেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার অনেক স্কুল হয়েছে এবং শান্তি-নিকেতনের বিশ্ববিদ্যালয়েও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে সন্দেহ নেই। তবু আমাদের মনে হয় যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের যথার্থ মূল্যায়ন বিশেষ করে সুর রচনার দিক থেকে বোধহয় হয় নি। আমাদের এই ধারণা যে অমিয়নাথের রবীন্দ্রসঙ্গীত চিন্তাকে কেন্দ্র করে একথা বলতে আপত্তি নেই। মুখপাত হিসাবে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

তখন বোধহয় ১৯৪০/৪১ সাল হবে। অমিয়নাথের সান্ধ্য বৈঠকে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা চলছে। তখন নামকরা গাইয়েদের মধ্যে শ্রীমতী কনক দাস ছিলেন অন্যতম। শ্রীপঙ্কজ মল্লিক মহাশয় তখন রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছেন। অমিয়নাথ সম্প্রতি শোনা পঙ্কজ বাবুর 'প্রলয় নাচন' গানখানির ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন। মনে আছে বলেছেন, 'আহা কি 'ওভারটোন' ওয়ালা ভরাট গলা আর কণ্ঠেই বা কি সুরের রেশ! রবীন্দ্রসঙ্গীতের পক্ষে উপযুক্ত কণ্ঠই বটে! বীরেন আচার্য মশাই তৎক্ষণাৎ একটি ছেলেকে গানখানি করতে বললেন। ছেলেটি খালি গলায় তৎক্ষণাৎ গানটি আরম্ভ করেদিল। প্রথম পংক্তি শেষ না হতেই কিন্তু অমিয়নাথ

গানটি থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'দাঁড়াও হে! হারমনিয়ম তো নেই। গলায় আগে ষড়জ্ দাও—স্কেলটা বল।'

ছেলেটি স্কেলের ষড়জ গলায় ভেঁজে নিয়ে ওই প্রথম স্বর থেকেই গানখানি আরম্ভ করে দিল যার স্বরলিপি করলে দাঁড়াবে স রে গা গা গা—। অমিয়নাথ আবার থামিয়ে দিলেন। তাঁর স্বভাব সুলভ হাল্কা চালে বললেন, 'উহু! হল না! হল না! রেকর্ডে যে গান আমি শুনেছি তার আরম্ভ হচ্ছে কোমল ধৈবত থেকে। ঠিক তেমনটি না হলে সে গানের সুরটাই পাল্টে যাবে।'

অথচ আমরা গানটার কোনও ভুল বুঝতে পারিনি। আর ছেলেটিও নাছোড়বান্দা। বললে, কিন্তু সুরটাতো ঠিকই আছে। কোথা থেকে আরম্ভ তা আবার বুঝবো কি করে?

অমিয়নাথ চুপ করে গেলেন। বুঝলুম বিশেষ কিছু বলবার থাকলেও চেপে যাচ্ছেন। বেনা বনে মুক্তো বিতরণ করতে তিনি রাজী নন। শেষকালে ছোট্টজবাব এলো, 'তা বটে! কি করেই বা বুঝবে! তবে একটা কাজ কর। স্বরলিপি দেখে অন্ততঃ গানগুলোর আরম্ভের পর্দাটা দেখে নিও।'

সেদিনকার মতন এই খানেই এই প্রসঙ্গের ইতি হল বটে তবে বেশ কিছুদিন পরে আমার জিজ্ঞাসুবৃত্তি সান্যাল মহাশয়ের কাছে কিছু কৈফিয়ৎ আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল। ঘটনাটা বছর দশেক পরে। তখন অমিয়নাথের ইংরাজী বই 'রাগ ও রাগিণী' আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তাঁর স্নেহের দাবীদার এই অভাজন যথা সময়ে তাঁর কাছ থেকে একখানি বই উপহার পেয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে একটি আদেশ, রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই বইখানির গুণাগুণ বিচার করতে হবে।

ইতিমধ্যে আমরা বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষক শ্রীদ্বিজেন চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে 'রবিতীর্থ' সঙ্গীত শিক্ষার আসরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিম কিছু পেয়েছি। শিক্ষাগুরু হিসাবে দ্বিজেনদা অতুলনীয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্কেল সংক্রান্ত বিষয়টি জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেছিলেন যে নিজের গলার প্রসার হিসেব করেই স্কেল ঠিক করতে হবে তবে স্বরলিপি অনুসরণ করলে রাগবিভ্রম হওয়া উচিত নয়। আর স্বরলিপির স্কেলে যদি ভুল থাকে তো তাঁর কিছু করার নেই। সাফ জবাব।

যাই হোক, রাগ ও 'রাগিণীর' বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে অনুসরণে রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গানের বিশ্লেষণ করে একদিন সান্যাল মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করলুম। তিনি আমার বিশ্লেষণের ফলাফলগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে নিয়ে কয়েকটি গান করতে বললেন এবং সেগুলো করাও হয়ে গেল। এই প্রসঙ্গে আমি সেই 'প্রলয় নাচন' গানখানির স্কেলের ব্যাপারটা বোঝবার জন্য রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকখানি ভৈরবী সুরের গান যেমন 'অমল ধবল পালে লেগেছে' 'আমার রাত পোহাল' ইত্যাদি গানগুলো শোনাবার পর 'ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা' গানটি 'মিশ্র ঝিঁঝিট' সুরে তাঁকে শোনালুম। সেই সঙ্গে আমি দেখালুম যে এই গানটির স্কেল একই রেখে যদি কোমল ধৈবত থেকে আরম্ভ করা যায় তো গানখানি ভৈরবী সুরের পরিচিতি লাভ করতে পারে। সেইসঙ্গে অমিয়নাথকে আমি দেখিয়েছিলুম যে এই একই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন স্বরলিপির 'ওগো শেফালীবনের মনের কামনা' ও 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার' এই দুটি গানের সঙ্গে আধুনিক স্বরলিপির কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং তারই ফলে রাগরাগিণীরও কি পরিবর্তন হয়েছে। এ সম্বন্ধে অমিয়নাথের মতামত ছিল

যথেষ্ট পরিষ্কার কিন্তু সেটা পরিষ্কার করে প্রচার করবার মতন শক্তি আমার ছিল না। এবং এখনও নেই। বিশেষ করে স্বরলিপি প্রকাশের ও রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে শেষ কথা বলবার অধিকার একমাত্র বিশ্বভারতীর আছে। সুতরাং অমিয়নাথের বাক্যালাপের মধ্যে যে ইঙ্গিতটুকু ছিল সেটুকু এখানে তাঁরই মুখের জবানীতে (যতদূর সম্ভব) ব্যক্ত করছি।

অমিয়নাথ বলেছিলেন "ভারতীয় সঙ্গীতের এই হল মুশকিল যে সুরকার বা গীতিকার ইউরোপীয় পদ্ধতির মত স্বরলিপি করার সঙ্গে সঙ্গে তার স্কেল বলে দেন না। আমাদের ক্লাসিকাল গায়ক বা বাদ্যযন্ত্রীরা প্রথমে রাগ রাগিণীর নামটি ঘোষক মারফৎ শুনিয়ে দেন তারপর তবলা বা তানপুরায় স্কেলটি ধরে নিয়ে তার পর সঙ্গীত প্রয়োগ সুরু করেন। তার ফলে সেই গান শোনা কালীন স্বরলিপিকারের পক্ষে স্কেল নির্দ্ধারণ করবার কোনও অসুবিধা হয় না। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে যতদূর শুনেছি এই পদ্ধতিতে স্বরলিপি তৈরী করা হয় নি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতস্বরাঘোপ পদ্ধতি যতদূর শুনেছি মুখে মুখেই হত এবং পরে স্বরলিপিকারকে ডেকে রবীন্দ্রনাথ গানটি শুনিয়ে দিতেন। সেই সময় বোধহয় তিনি কোনও স্কেল বা গানের আরম্ভের স্বর কাউকে বলে দেননি,—অন্ততঃ এমন কথা শোনা যায় নি। এ ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার করতে হলে এখন স্বরলিপিকারদের নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয়। আমি অবশ্য দু-একজন রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম সারির বিশেষজ্ঞদের এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে কোনও সদুত্তর পাইনি।"

হয়ত একটা ভাঙ্গাগড়ার বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এই পর্যন্ত শোনাই যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমার অনুসন্ধিৎসা তখন বাধা মানে নি। তাই যেটা অবশ্য জিজ্ঞাস্য তাই জিজ্ঞাসা করলুম, যে আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রে কি এর কোনও জবাব নেই যেখানে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে একটা নির্দিষ্ট উপায় রয়েছে ?

এর উত্তরটা অমিয়নাথের ক্ষীণ কণ্ঠেও বজ্রগম্ভীর হয়ে উঠলো, "শুধু আছে নয়, অনেক ভাল ভাবেই আছে। প্রাচীনেরা চিন্তা করেছিলেন যে গীত বা গানের পদ যে সকল ভাবকে প্রকাশ করে সেই ভাবের অনুযায়ী বা সামঞ্জস্য ভাবে গ্রাম, জাতি বা রাগের সমাবেশকে ঐ গান বা পদের সঙ্গে যোজনা করলেই সেই গান প্রীতিপ্রদ বা সুন্দর হয়। এরূপ চিন্তা থেকে অনেকরূপ অনুসিদ্ধান্ত করা হয়েছে। যেমন,—গানে কিরূপ স্বর সমাবেশ হবে বা হওয়া উচিত। বলতে বাধা নেই যে উচিত বা অনুচিত চিন্তা আমাদের কাছে আজকের দিনে কিছুটা ভয়াবহ। কিন্তু প্রাচীন আর্যগণ বর্ণনাচ্ছলে উচিত ও ললিত এই দুটি শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন। উচিত অর্থ যে কার্য সম্পাদিত হতে চলেছে বা যে উদ্দেশ্য সফল করতে হবে। না করাটা হল অনুচিত। যেমন—করুণ রসের পদে অমুক গ্রাম বা অমুক জাতি প্রয়োগ করা উচিত। গীত, বাদ্য, নৃত্য—এগুলি ক্রমিক ব্যাপার এবং তাদের উপস্থাপিত করার মধ্যে উদ্দেশ্য আছে। সুতরাং উচিত অনুচিত বিচারও আছে। আমাদের বাংলা গানের স্বরলিপিকারদের এই দিকে নজর রাখা উচিত।"

আমি তাঁর সুদীর্ঘ বক্তব্যের ভেতরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করলুম। কি বলতে চাইছেন অমিয়নাথ। সন্দেহ নিরসন করে নেবার জন্য জানতে চাইলুম যে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীনদের মতামতগুলো আগেভাগে জেনেই কি গানে সুরারোপ করেছিলেন বলে তাঁর বিশ্বাস। এবং তা যদি না হবে তো

তাঁর বেশ কয়েকটি গানের বিশ্লেষণের ফলাফল সেইদিকেই নির্দেশ দিচ্ছে কি করে। আমি আমার খাতার নোটগুলোর প্রতি অমিয়নাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম।

অমিয়নাথ কিন্তু আমার খাতায় দৃকপাতও করলেন না—বললেন, "ওসব আমি আগেই দেখেছি। তোমার বিশ্লেষণের ফলগুলো দেখাবার আগেই। এর মানে কিন্তু এটাই নিশ্চিত নয় যে রবীন্দ্রনাথ এই প্রাচীন মতামতগুলো জানতেন বা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, উদয়শঙ্কর বা তিমিরবরণ স্রষ্টার ভূমিকা নিয়েই সঙ্গীত জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এঁরা যা করবেন বা করেছেন এ যুগে সঙ্গীত জগতে সেইটাই আদর্শ। যদি প্রমাণ হয় যে রবীন্দ্রনাথ এই প্রাচীন মতামতকে অনুসরণ করেছেন তো ভালই আর সেই মতামত না জেনেও যদি তিনি "গ্রেট মেন"দের উচিত কার্য মতন "এলাইক" চিন্তা করে থাকেন তো গোল মিটেই গেল। তোমার স্বরলিপির সঠিক স্কেলের সন্ধান তো তাঁর গানেই দেওয়া রয়েছে।"

এবার আমার ভাববার পালা। যদি ধরে নেওয়া যায় যে কবিতাগুলোর মধ্যে রসভাবাদির নির্দেশ মতই গানের সুরারোপ করা হয়েছে তাহলে সেই গানগুলোর বাদীস্বরকে যদি নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ মত পর্দায় বসিয়ে দেওয়া যায় তো স্কেল খুঁজে পাবার তো কোনও অসুবিধা হওয়া উচিত নয়। আমার মনে তখনই অমিয়নাথের প্রতি একটা অনুযোগের ঝড় বয়ে গেল। অমিয়নাথের কাছে শুনেছিলুম যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমিয়নাথের একাদিক্রমে পাঁচ ঘণ্টা সঙ্গীত বিষয়ে আলাপ হয়েছিল। শান্তিদেববাবু বা শৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে অমিয়নাথকে একাধিকবার সঙ্গীত বিষয়ে আলাপ করতে দেখেছি এবং দু-একটি ক্ষেত্রে আমিও উপস্থিত ছিলুম। বিশ্বভারতীর অনুরোধে ভারতীয় সঙ্গীতের ওপর অমিয়নাথ একখানা বেশ বড়সড় বই লিখে তার প্রকাশনার জন্যে পাণ্ডুলিপি পাঠাবার পর বিশেষ কোনও কারণে বইখানির সমগ্র প্রকাশ না করে তার নিতান্ত একটি ছোট অংশ 'প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত চিন্তা' নাম দিয়ে বিশ্বভারতী প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ এবং বিশ্বভারতীর এত কাছাকাছি থেকেও স্বরলিপির এই স্কেল নির্ধারণ পদ্ধতি তিনি কেন চালু করতে পারলেন না। অন্তত এ সম্বন্ধে একটা প্রস্তাবও তো তিনি করতে পারতেন। সুতরাং এর উত্তরটা আমি অমিয়নাথের কাছ থেকে শুনতে চাইলুম। এবং উত্তর শুনে আমি অবাক হয়ে গেলুম। তিনি বললেন, "কি করে জানছ যে এই প্রস্তাব আমি দিইনি। তাছাড়া আমার এই 'প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত চিন্তা' বইখানিতে আমার এই মতামত আমি যথাযথ ভাবেই উল্লেখ করেছিলুম। যাই হোক এ বিষয়ে আর বেশী কথা না বলাই ভাল। কথা বললেই কথা বেড়ে যায়। আমি যে বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার জন্য একটা ডাক পেয়েছিলুম সেটা তো জান। তা সে আর হল কই ?" *সেদিনকার মত এইখানেই শেষ হল। বাড়ী ফেরবার পথে মনে পড়ল যে বিশ্বভারতীর অনুরোধে তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীতশিক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার করে একটি ব্লু প্রিন্ট খাড়া করেছিলেন

*সমকালীনের পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই যে অমিয়নাথ বিস্তৃতভাবে যে কথা সেদিন বলেছিলেন সেইগুলো লিপিবদ্ধ করার আগে আমি, 'প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত চিন্তা' বইখানি পড়ি এবং এই প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্যটুকু এই বইখানি থেকেই হুবহু নিয়েছি।

এবং আমাকে সেটা দেখিয়েও ছিলেন। কিন্তু এই শিক্ষা পদ্ধতির গোড়ার কথা ছিল গলা সাধার অভিনব নির্দেশ। সা-রে-গা-মা বা সারেগা-রেগামা ইত্যাদি না করে খণ্ডমেরু বা মাতৃকার সাহায্যে অর্থাৎ স গ প—গ পনি—সগপনি ইত্যাদি স্বরের ক্রমগুলো সেধে যাওয়া। সে সব কাগজপত্র এখন আর পাওয়া যাবে না এটা নিঃসন্দেহে দুঃসংবাদ।

আর একদিনের কথা। সেদিন আমার বিশ্লেষণের খাতা থেকে কয়েকটা গান নিয়ে কথা হচ্ছিল অমিয়নাথের সঙ্গে। কয়েকটা গানের রাগ 'এলিমেন্ট' বেশ বেশী সংখ্যায় রয়েছে। যেমন 'যৌবন সরসী নীরে' 'আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার' 'হে ক্ষণিকের অতিথি' এই সব গানের বিশ্লেষণগুলো বিচার করা হল। গানগুলোর অমিয়নাথ খুব তারিফ করলেন। বললেন 'শেষোক্ত গানটি বিশেষ করে অপূর্ব গান। অবশ্য এই ধরণের সব ভাল ভাল গানগুলোকে শিল্পীরা যাদুঘরে বন্দী করে রেখেছে। বড় একটা গায় না।' এই গানটি প্রসঙ্গে আমার একজন নামকরা বাঙ্গালী সমালোচক শিল্পীর প্রসঙ্গ মনে পড়ে গেল। আমি বললুম যে এই গানটি অমুক শিল্পী রবীন্দ্রনাথের সামনে ভৈরবীর তান সংযুক্ত করে গেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তার ওপর কোনও মন্তব্য করেন নি খালি একটু মুচকি হেসেছিলেন। এই বৃত্তান্ত আমার সেই শিল্পীর লেখা থেকেই সংগ্রহ করা। অমিয়নাথ বললেন, 'শুধু মুচকি হাসা ছাড়া আর তিনি কি-ই বা করতে পারতেন। এ কথা কি বলতে পারতেন যে গানটাকে ভৈরবীতে বাঁধা না বলে সৈন্ধবীতোড়ীতে বাঁধা বললেই সবচেয়ে কাছাকাছি বলা হত! রবীন্দ্রনাথের গানে তান লাগানো খুব সহজ কাজ নয় একথা রবীন্দ্রসঙ্গীত করবার সময় সকলেরই মনে রাখা উচি। আর দেখ রবীন্দ্রসঙ্গীতের রাগ নিয়ে অনেকেই টানা হেঁচড়া করে। আবার কাউকে বলতে শুনেছি যে গানগুলো ঠুংরী পর্যায়ের। এধরণের কথা বলবার আগে আমাদের একবার প্রাচীন পুঁথি হাতড়ে দেখা উচিত। লোকে বলে যে ওয়াজিদ আলি শাহর সময়ে কদরপিয়ারের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে ঠুংরীর আমদানী হয়েছিল। ধ্রুপদ গানের মতন রবীন্দ্রনাথের গানে চারটে ভাগ। ঠুংরী গানে এই চারতুক খুব কমই দেখা যায়। বরং প্রাচীনকালের রূপক বলে একরকম গানের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শার্ঙ্গদেব এই গান সম্বন্ধে বলেছেন যে বিশিষ্ট রূপরচনার সাহায্যে এবং ভিন্ন ভিন্ন তুকে নতুন নতুন রাগ তাল পালের সাহায্যে একে ব্যক্ত করা হয়। রস বা ভাবের পরিবর্তন অনুসারে এর রাগাংশের পরিবর্তন সাধিত হয়। হরিবংশে ছালুক্য বলে একরকম গানের উল্লেখ আছে। এর অভিনবত্ব ছিল ভিন্ন ভিন্ন তুকে বিভিন্ন রাগের ব্যঞ্জনা মাধুর্য, আমার বোধহয় ঠুংরী গান এই ধরণের গানের রূপান্তর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে ঠুংরী গানকে অনুসরণ করেন নি এটা নিশ্চিত। এ সম্বন্ধে বরং অতুলপ্রসাদকে উল্লেখ করা যেতে পারে।

অমিয়নাথের একটি প্রিয় রাগ ছিল খাম্বাজ। তাই বিশ্লেষণ করা গান থেকে বেছে নিয়ে 'যদি তারে নাই চিনি গো' গানটি তেওড়া তালে প্রথম কলিটা শোনালুম। অমিয়নাথ গানটি শুনে উৎসাহের সঙ্গে বললেন 'বাঃ বাঃ। 'দাদরা' ঢঙের জিলা খাম্বাজের ওপর গানটি বেশতো। তুমি আগে বাঢ়োতো দেখি!'

আমি গানটি পুরো শুনালুম। অমিয়নাথ বললেন 'হ্যাঁ কোমল গান্ধার সঞ্চারীর প্রথমেই খাম্বাজের মধ্যে 'আপন রঙের' সঞ্চার করছে বটে।' খাম্বাজের মধ্যে কোমল গান্ধার দেখাবার

জন্যে জোহরা বাঈ এর রেকর্ডে গাওয়া বিখ্যাত গান 'কোয়েলিয়া কুক শুনাওয়ে' গানটির মধ্যে গহরজান নতুন করে যে কোমল গান্ধার লাগিয়েছিলেন সেটিও গেয়ে দেখালেন। বললেন "এ গানেও কোমল গান্ধার লেগেছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানটির মত এতটা সবল ও স্থায়ীভাবে কোমল গান্ধার ওয়ালা খাম্বাজ তিনি কখনও শোনেন নি।" আমার খাতার মধ্যে "আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে" গানটিতে শুদ্ধ রেখাবের প্রবল ব্যবহার দেখে অমিয়নাথ গানটি শুনতে চাইলেন। এবং শোনবার পর ধৈবত থেকে খাড়া তারার রেখাবে যাতায়াত করা সুরটুকুর সঙ্গে (বসন্তের এই মাতাল সমীরণে) বদল খাঁ সাহেবের "বনে বনে ধুম মচে" গানটির সুরের একই ধরণের ব্যবহার দেখালেন যেটা বৈয়াকরণিকদের মতে অশুদ্ধ। এইখানে বলে রাখি যে এই গানখানি সুরেশদার বাড়ীতে অতি নিভৃতে একদিন আমরা কজন ভীষ্মদেবের কণ্ঠে শুনেছিলুম।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে বিভিন্ন রাগের মিশ্রণ যে কয়েকটি গানে বিশেষ মাধুরীর সঞ্চার করেছে একথা অমিয়নাথ বার বার বলতেন। এবং তাঁর বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে গানগুলোর রসভাবাদির পরিপ্রেক্ষিতে সুরারোপের পদ্ধতিটি যেন বিশ্লেষণ করে নির্ধারণ করে নেওয়া হয়। তিনি প্রায়ই বলতেন যে রবীন্দ্রনাথের সুরারোপ পদ্ধতিকে যথার্থ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে বাংলা গানের নতুন দিগন্ত খুলে যেতে পারত। এটা খুবই পরিতাপের কথা যে এদিকে বিশেষ কেউ নজর দেন নি। মোটামুটি একটা প্ল্যান ছিল তাঁর যে রবীন্দ্রনাথের গানগুলোকে বিভিন্ন বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিভাজন করা। গীতবিতানের প্রেম, পূজা ইত্যাদি মোটা দাগের বিভাজন তিনি যথেষ্ট বলে মনে করতেন না।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির প্রশংসায় অমিয়নাথ পঞ্চমুখ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে একটা পূর্ব পরিকল্পনা মত নৃত্যনাট্যগুলির প্রযোজনা করে গেছেন তার উদাহরণ প্রসঙ্গে অমিয়নাথ "চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্যের কথা বলেছিলেন। সাধারণতঃ নাটকের আরম্ভেই স্থান, কাল ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কথা বলে দেওয়া হয়। এই নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ কোনও কিছু প্রসঙ্গের অবতারণা না করেই গান শুরু করলেন "গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে"। বোঝা গেল ঘটনার আরম্ভ প্রাবৃটকালে হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল ঘন অরণ্য সমাকীর্ণ পর্বতভূমির পটভূমিকায়। স্থানটি ঝরণার শব্দে মুখর। কাদামাখা বনভূমির মধ্যে রাজকুমারী ও তাঁর সখীরা পুরুষ বেশে চিতা বাঘের পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে ধনুর্বাণ হাতে সন্তর্পণে এগিয়ে চলেন। ব্যস! স্থান, কাল, পাত্র, পরিবেশ ও উত্তেজনার অবতারণা একই সঙ্গে হয়ে গেল। শব্দ যোজনার বৈশিষ্ট লক্ষ্য করার মতন। ঘন ও মেঘ এই দুটি সমার্থক শব্দ পাশাপাশি ব্যবহার করা হয়েছে ধ্বনি ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করবার জন্যে। ঠিক এই ধরণের ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর "সোনার তরী" কবিতায়। তবে তিনি বললেন যে আধুনিক নৃত্য পরিকল্পনা অবশ্য তাঁর মনোমত হয় না। এই চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য প্রযোজনা দেখবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে নৃত্য প্রয়োগ যথার্থ হয়নি বলেই তাঁর মনে হয়েছে। যেমন প্রথম গানটির আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই চিত্রাঙ্গদা ও সখীদের প্রবেশ ও নৃত্যের প্রয়োগ যথার্থ নয়।

নৃত্যনাট্য পরিবেশন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের কথাও অমিয়নাথ প্রায়ই বলতেন। তিনি বলতেন যে প্রাচীন নাট্য পরিবেশন করার নির্দেশনায় গীত সব থেকে প্রাধান্য পেত। বাদ্য

গীতকে অনুসরণ করত এবং নৃত্য করত বাদ্যকে। নাট্য প্রচেষ্টায় চার রকমের বৃত্তি ছিল। যেমন, কৈশিকী, সাত্বতী, আরভটি ও ভারতী। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য প্রধানতঃ কৈশিকী বৃত্তিকে অনুসরণ করত। এই বৃত্তি সৌন্দর্য সুকুমারতার সাহায্যে রৌদ্র, শৃঙ্গার ইত্যাদির রসকে ফুটিয়ে তোলে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা প্রধান বিশেষত্ব হল এই যে প্রয়োগের সময় তার অর্থ এমনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। কথাটা অবশ্য নতুন কিছু নয় কিন্তু অমিয়নাথ এই প্রসঙ্গে রেকর্ডে শোনা কয়েকটি গান ও নৃত্যনাট্যে পরিবেশন করা কয়েকটি গানের উল্লেখ করে বললেন যে গানগুলোর প্রয়োগ যথাযথ লয়ে হয়নি, সে নৃত্যনাট্যের নাচ কম্পোজ করার জন্যেই হোক বা তিন মিনিট রেকর্ডের স্বল্প সময়ের জন্যেই হোক।

তাঁর মতে গানের তাল ও লয় হল ভাষার সেই ভূষণ যা পরিধান করলে অসুন্দর ঢাকা পড়ে এবং সুন্দর অধিকতর সুন্দর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের গানকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল বর্ণনামূলক গান, যেমন ঋতু বর্ণনা। সেই বর্ণনার সঙ্গে প্রাকৃতিক ধ্বনির ছন্দ (অনোমেটপোয়িক) মিলিয়ে সাধারণতঃ দ্রুত ছন্দে গাওয়া হয়। আর সে ক্ষেত্রে লয়টাও হয় দ্রুত। আর যেখানে গানগুলো "লিরিক" ধর্মী সেখানে গানের ছন্দ ও লয় বাঁধা উচিত কিছুটা ধীরে। এর কারণ দেখাতে গিয়ে অমিয়নাথ বলেন যে গানের ভাষাকে বোঝার জন্যে শ্রোতা সব সময় গাইয়ের চেয়েও অন্ততঃ একনিমেষ পিছিয়ে চলে। সুতরাং লিরিক ধর্মের গানগুলোকে শ্রোতার কানে বোঝার মতন করে পৌঁছে দেবার জন্যে শিল্পীর এই লয়ের ব্যাপারটায় খেয়াল থাকা দরকার। উদাহরণ প্রসঙ্গে অমিয়নাথ কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের উল্লেখ করেন ; যেমন, হাম্বীর রাগের উপর গান "সখী আমারি দুয়ারে", ভৈরবীতে বাঁধা "অনেক দিয়েছ নাথ"। এই গানগুলির তাল চতুর্মাত্রিক খেয়ালের তাল হলেও ধ্রুপদের ঢঙে বাঁধা এবং ঢিমা লয়ে গান না করলেই গানটি মাটি।

আজ অমিয়নাথ আর ইহজগতে নেই। সুতরাং তাঁর মতামতগুলোকে মদত যোগাবার কেউ নেই একথা সত্যি। তবু মতামতগুলোর কিছু দাম আছে মনে করেই অমিয়নাথের স্মরণে রবীন্দ্রনাথ-অমিয়নাথ সংবাদ যেটুকু জানা গিয়েছিল সেটুকুই তুলে ধরা হল। সবশেষে এটুকুও বলার দরকার অমিয়নাথের মুখে আমরা শুনেছি যে এর মধ্যে অনেক কথাই তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ নাকি বলেছিলেন যে "আপনার সঙ্গে আগে আমার সাক্ষাৎ হলে আমার সঙ্গীত জীবনটা হয়ত বদলে যেতে পারত।" পাঠক এই উক্তির তাৎপর্য আশা করি নিজেই বুঝে নেবেন।

অরুণাচলের আদিভাষা ও সংস্কৃতি

কমলেশ দাশগুপ্ত

অরুণাচলে প্রায় ষাটটি কথ্যভাষা (বা উপভাষা) প্রচলিত। ভাষাতাত্ত্বিকরা এগুলিকে কুড়িটি বিভাগে গোষ্ঠীভুক্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, ভাষা ও কথ্যভাষার মধ্যে প্রভেদ করার মত অবস্থা অরুণাচলে এখনও আসে নি। এই প্রদেশের অন্তর্গত তিরাপ জেলার খাম্‌তি উপজাতি ব্যতীত অন্য কোনও ভাষার কোন লিপি নেই।

নিছক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি কোণ থেকে দেখলে, শুদ্ধ ও কথ্য ভাষার মর্যাদায় কোন পার্থক্য নেই। সামাজিক দৃষ্টি কোণ থেকেই ভাষার মূল্যায়ন, মর্যাদা ও পৃথক সংজ্ঞার দাবী কথ্যভাষার ওপর। নানাকারণে কোন একটি কথ্যভাষা ভাষার মর্যাদা লাভ করে।

সাধারণত আমাদের অনেকের ধারণা যে উপজাতিদের শব্দভাণ্ডারে প্রাচুর্যের অভাব। এই ধারণা ভ্রমাত্মক। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক উপজাতির শব্দভাণ্ডার যথেষ্ট সমৃদ্ধ এবং এদের জীবনযাত্রা কৃষ্টি ও সংস্কৃতির জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই এরা অতি সহজেই নিজ ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে সক্ষম। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট, সমাজ জীবন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে, এবং তারই প্রকাশ ভাষায়। কাজেই যে কোন উপজাতির ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মনোজগতে প্রবেশ করতে পারা যায়। প্রত্যেক ভাষারই কিছু না কিছু স্ব-কীয় গুণ ও বৈশিষ্ট থাকে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, আমরা কোন চিন্তা বা ঘটনা আমাদের ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রয়াসে হয়ত একটি বাক্য রচনা করে ফেলি, কিন্তু পৃথিবীর দুর্গম প্রদেশের কোন উপজাতি সেই চিন্তা ও ঘটনাকে মাত্র একটি কি দুটি শব্দে প্রকাশ করতে সক্ষম।

অরুণাচলের সিয়াং জেলায় আদি উপজাতিদের বাস। 'আদি' বলতে অবশ্য বহু বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপজাতিদের বোঝায়। যেমন—গালো বা গালং, মিঞঙ, পদম্‌, মীনং, পাসি, বোরি বোকার, রামো, পালিব ইত্যাদি। বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন কথ্যভাষা।

গঠন প্রণালীর দিক থেকে আদি উপজাতিগুলির ভাষাগুলিকে 'যোজনধর্মী' ভাষা বলা হয়। কতকগুলি অব্যয় জাতীয় শব্দ, যেগুলির নিজস্ব কোন অর্থ নেই, বাক্যের মধ্যে শিকলের মত পরস্পর যুক্ত হয়ে অর্থ প্রকাশ করে। আবার কখন ও দুটি বা তিনটি ধাতু ক্রমান্বয়ে যুক্ত হয়ে কোন ধারাবাহিক অর্থ প্রকাশ করে। বাংলা, ইংরাজী প্রভৃতি ইন্দোইউরোপীয়ান ভাষার সাথে আমরা পরিচিত বলে, এই ভাষাগুলি প্রথমে দুর্বোধ্য মনে হয়, কিন্তু এইসব যৌগিক শব্দগুলির সম্যক পরিচয় লাভ করলে এবং ব্যবহার আয়ত্ত হলে, ভাষাগুলি সহজেই শেখা যায়।

আদি উপজাতির মধ্যে মিঞঙ্‌ একটি বৃহৎ গোষ্ঠী। লোক সংখ্যা প্রায় কুড়িহাজার। এদের ভাষায় 'ঙ' অর্থে আমি, 'সু' অর্থে কথা বলা, 'দ' অর্থে খাওয়া। 'দুঙ' শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় 'ছে', 'ছেন' ইত্যাদি অন্বয়ী বিভক্তির মত ঘটমান বর্তমান ক্রিয়ার্থ প্রকাশ করে। এখন এই শব্দগুলি

সাজিয়ে, মিঞ্রুভাষা বলতে পারা যায়—ঙ দ-হুঙ্ = আমি থাচ্ছি। ঙ দ-প—হুঙ্ = আমি থাচ্ছি (কোন কাজ করার আগে)। ঙ লু-প-হুঙ্ = আমি বলছি (কোন কাজ করার আগে বা কোন জায়গায় যাওয়ার আগে) এখানে 'প' শব্দের কোন অর্থ নেই। 'মান্' আনন্দার্থে ও 'লি' ইচ্ছার্থে ব্যবহার হয়। 'গ' শব্দের অর্থ এদিক ওদিক ও 'গি' শব্দের অর্থ যাওয়া। ঙ গি-হুঙ্ = আমি যাচ্ছি। ঙ গি-লি-হুঙ্ = আমি যেতে ইচ্ছে করছি। ঙ গি-মান্-হুঙ্ = আমি আনন্দের সঙ্গে ঘুরছি। ঙ লু-মান হুঙ্ = আমি ঠাট্টা করছি। ঙ গি-গি-লি-হুঙ্ = আমি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা করছি।

মিঞ্রুরা পাহাড়ের অধিবাসী। পাহাড়ের ওপরে বা নীচে কোন বস্তুর অবস্থান সহজে নির্দেশ করার মত প্রচুর শব্দ এদের ভাষায় মেলে। বাঙ্গালা ভাষায় একটি মাত্র সর্বনাম শব্দ 'ঐ' প্রয়োগে আমাদের বেশ চলে যায়। কিন্তু এদের ভাষায় 'ঐ' অর্থে তিনটি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—এ = ঐ (সমতলে), তে = ঐ (ওপরে) এবং বে = 'ঐ' (নীচে)।

এদে এহিঙ্ = ঐ গাছটি (একই সমতলে); তে দে এহিঙ = পাহাড়ের ওপরে ঐ গাছটি; বে দে এহিঙ = পাহাড়ের নীচের দিকে ঐ গাছটি।

অরুণাচলের অনেক উপজাতির সাংস্কৃতিক জীবনে, মিথান্ (Boa Frontalis) একটি অপরিহার্য অঙ্গ। মিথানের সংখ্যানুযায়ী সামাজিক প্রতিষ্ঠার মান নির্ধারিত হয়। বিয়েতে কন্যাপণ হিসাবে মিথান্ অতি প্রয়োজনীয় সম্পদ। মিঞ্রু ভাষায় জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে মিথান্‌কে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন, এহ্ = মিথান্; ব = মাঝবয়সী মিথান্। বিভিন্ন উপদেবতার কাছে বলির মিথানের বিভিন্ন নাম: গিমাঙ্ এহ্—অনিষ্টকারী উপদেবতার উদ্দেশ্যে বলির মিথানের জন্য হিতকারী উপদেবতার উদ্দেশ্যে বলির মিথানের নাম। দত্‌গাঙ্ এহ্—মৃতের আত্মার মঙ্গল কামনায় যে মিথান্ বলি দেওয়া হয়। গৃহপালিত গবাদি পশু এরা নানাভাবে বাঁধে এবং সেজন্য মিঞ্রু ভাষায় নানা কথার প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—অগ্-নাম্—পায়ে বা গলায় একটা ফাঁস বাঁধা। রিন্-নাম্—মিথান্ বা গরুর গলায় দড়ি বেঁধে দড়ির প্রান্তভাগ যখন খুঁটি বা অন্য কিছুতে বাঁধা হয়। ডোন্-নাম্—ধানের আঁটি বা বোঝা বাঁধাদড়ির দুটি প্রান্ত এক করে আনা।

নানা কাজের জন্য লোকেরা গ্রামান্তরে যায় এবং ভিন্ন গ্রামে বন্ধুদের আতিথ্য গ্রহণ করে। এই রকম আতিথ্যের সম্পর্ক যেখানে পারস্পরিক, সেই বন্ধুদের আগিঙ্ বলা হয়। আগিঙ্ এদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট। অন্যথায়, কোন আগন্তুক আতিথ্য গ্রহণ করলে 'নিব' নামে পরিচিত হয়। ভাষাতেও এই সামাজিক বৈশিষ্টের রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে। যেমন…'সু' শব্দের অর্থ 'নিজের' ইঙ্ অর্থে অন্যের (সম্ভবত কথাটির উৎপত্তি 'আগিঙ' থেকে) এবং 'ঙ' অর্থে আমি বোরি উপজাতিদের ভাষায়—

ঙ দ-হুঙ্ = আমি থাচ্ছি। ঙ দ-সু-হুঙ = আমি নিজে থাচ্ছি বা নিজের বাড়ীতে থাচ্ছি। ঙ দ-ইঙ-হুঙ = আমি অন্য জায়গায় থাচ্ছি। মিঞ্রুদের ভাষায়—

বি দ-গঙ-তি-হুঙ = সে এদিকে ওদিকে অর্থাৎ নানা জায়গায় থাচ্ছে (দ-খাওয়া তি-জলপান করা)

ব্যবসার কারণে আদিদের অনেক সময় দূরান্তরে যেতে হয় এবং তখন পথে অনেকের সঙ্গে দেখাও হয়। এবং সাক্ষাৎপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি, একই, দিক কিংবা বিপরীত দিক থেকে আসছেকি না, মিঞ্রুরা সংক্ষেপে ও সুষ্ঠুভাবে বোঝাতে পারে—

এন্ = দূরে যাওয়া; এন্-প-নাম্ = সাক্ষাৎ করা (লোক দুটি যদি একই দিকে যায়); এন্-পে-সি-নাম্ = সাক্ষাত করা (লোক দুদি যদি বিপরীত দিক থেকে আসে)। ঙ বি-এম্ এম্-পে-সি-ত—বাক্যটির বঙ্গানুবাদ হবে—আমি তাকে দেখলুম (যে লোকটি আমার উলটো দিক থেকে আসছিল)।

আদিরা সমবায় ভিত্তিতে কাজ করে। গৃহ নির্মাণের সময় একে অন্যকে সাহায্য করে। সমাজের অর্থ নৈতিক এবং সমবায় ভিত্তিতে ক্রিয়াকলাপের প্রতিফলন দেখতে পাই এদের ভাষার মাধ্যমে। মেঞ্রু ভাষায়—

ঙ একুম্-ল আগের্ ই-সি-হুঙ = আমি নিজের কাজ করছি অথবা নিজের ঘরেই কাজ করছি। ই-মিন-গে হুঙ = আমি অন্যলোকের কাজ করছি বা অন্যের সঙ্গে কাজ করছি। ই = কাজ করা, সি = নিজের, মিন্-গে = অন্যের সঙ্গে অনুরূপভাবে বোকার ভাষাতে বলা হয়—

ঙ লে-গে ই-সু-দা-না = আমি অন্য বাড়ীতে কাজ করছি।

এরা অনেক উপদেবতায় বিশ্বাস করে। ঘর, নদী পাহাড়, বনে এই সব উপদেবতার ঠাঁই। লৌকিক ধারণা যে এই সব উপদেবতারাই এদের দৈনন্দিন জীবন চালনা করে। উপদেবতাদের সঙ্গে আদিদের জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতে প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণাও অনুরূপ। উপদেবতার বিরাগভাজনই কুষ্ঠ-প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধির কারণ। এই সব ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে, এরা চিরদিনের জন্য গৃহত্যাগ করে। 'চিরতরে গৃহত্যাগ'—ভাবটি প্রকাশার্থে, মিঞ্রুরা 'মে-পাক-নাম্' কথাটি ব্যবহার করে।

ঙ্ লু একুম্-এম্ মে-পাক্-ত = ত্যাগ করলুম। পাক্-ত = অতীতকাল বোঝাতে ব্যবহৃত হল। কিন্তু বাড়ীটির যদি ভগ্নদশা হয় মেরামতের জন্য কিছুকাল বাড়ী ছেড়ে যেতে হয়, তবে 'মে-লেত-ত' বলতে হবে।

উৎসবকালে বা কোন লোক মারা গেলে, আদিরা কতকগুলি নিয়ম (taboo) মেনে চলে। এই সময় এরা গ্রামের বাইরে যায় না এবং বাইরের লোকের কাছে কোন কিছু প্রকাশও করে না। ঞ বা ঞত (নিয়ম, নিয়ম মানা) শব্দের সাহায্যেই এরা উপরিউক্ত বাধানিষেধ বোঝায়। সাধারণত নঞর্থক উক্তির জন্য মা ব্যবহার করা হয়। যেমন—ঙ গি-মা-য়ে = আমি যাব না (মা = না, ও ভবিষ্যৎকাল বোঝাতে 'য়ে' ব্যবহৃত হল)। কিন্তু কোন উৎসব ও মৃত্যুজনিত নিয়ম পালনের জন্য, 'আমি বাইরে যাব না' বোঝাতে বলা হয়—

ঙ ঞ-হুঙ = আমি নিয়ম পালন করছি অতএব বাইরে যাব না। লু-ঞ-হুঙ = আমি কথা

বলব না কারণ নিয়ম পালন করছি। দেখা যাচ্ছে, সম্পূর্ণ ভাবটী প্রকাশ করতে আমাদের ভাষায় একটি বড় বাক্য রচনা করতে হয়, কিন্তু এদের ভাষায় মাত্র তিনটী শব্দে সেই ভাবটী সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা যায়।

প্রশ্নের ম্যাক্সমুলার তুর্কীভাষা সম্বন্ধে বলেছেন যে ভাষাটী শিখতে ভালই লাগে। প্রকৃত পক্ষে সমস্যা ভাষাগুলির জটিলতা থেকে এটি মুক্ত এবং সহজেই শেখা যায়। ম্যাক্সমুলারের এই উক্তি আদিভাষাগুলি সম্বন্ধে ও প্রযোজ্য।

(বাংলা 'ড' শব্দের ব্যবহার আদিভাষাতে নেই কাজেই এটি উচ্চারণ করতে অসুবিধা হতে পারে। জঙ্গল কথাটির 'জ' যেমন ভাবে উচ্চারণ করা হয়, আদি ভাষায় 'ড'টির উচ্চারণ সেই রকম হবে)।

তেলিয়াগড়ীর প্রাঙ্গণে : শ্রীসবিৎশেখর মজুমদার। 'অক্ষর ৫২, নন্দনা পার্ক কলকাতা ৩৪ থেকে প্রকাশিত। মূল্য সাত টাকা।

তেলিয়াগড়ী ফোর্ট এখন শুধুই ইতিহাস। বিহারের রাজমহলে একটা পাথরের ভগ্নস্তূপ মাত্র। লোকচক্ষুর অন্তরালে তার প্রায় হারিয়ে যাবার অবস্থা। কিন্তু একদিন তা ছিল না। উত্তর ভারত থেকে বিহারের মধ্যে দিয়ে ধনজনসমৃদ্ধ শ্যামল বাংলার মাটিতে প্রবেশ করার একমাত্র পথ তেলিয়াগড়ী শক্‌রিগলি-গিরিবর্ত্ম'। এই সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম তাই বাঙ্গালী জাতির উত্থান পতনের ইতিহাসে বহু বছর একটি প্রধান ভূমিকা অধিকার করেছিল। এই কেল্লার ইতিহাস বাঙ্গালীর কাছে মোটেই উপেক্ষার নয়। 'রেলপথ সূত্রপাতের পূর্বে বাণিজ্যলক্ষ্মীর যাতায়াত এই পথেই ছিল বেশি। আর এ সম্বন্ধে সর্বপ্রাচীন সাক্ষ্য জাতকের কয়েকটি গল্প' এই হল বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের মত। প্রায় হারিয়ে যাওয়া সেই ইতিহাসকে খুঁজে এনে বাঙ্গালীর চোখের সামনে তুলে ধরেছেন লেখক।

অধুনা শকরিগলি (লেখকের মতে শঙ্করীগলি। পীঠপতি শ্রীদেবরক্ষিতের সহধর্মিণী শঙ্করী দেবীর নাম থেকে উৎপত্তি—কালক্রমে শক্‌রিগলি) রাজমহল অঞ্চল বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও একদিন এ অঞ্চল ছিল বাংলা দেশের মধ্যে (আধুনিক পশ্চিমবঙ্গ)। তাই এখানকার ইতিহাস জানার ইচ্ছা বাঙ্গালী পাঠকদের পক্ষে স্বাভাবিক। লেখকের বাল্য কৈশোর ও প্রথম যৌবন কেটেছে এই অঞ্চলের কোলে। এই অঞ্চল চিরকাল তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে। এখানকার ইতিহাস তিনি চর্চা করেছেন বহুদিন ধরে। সেই ইতিহাস চর্চার ফল এই 'তেলিয়াগড়ীর প্রাঙ্গণে'।

লেখক একাধারে কবি গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। তাঁর মন কল্পলোকের প্রাঙ্গণেই বেশি ঘোরাফেরা করে। মনে হয় তেলিয়াগড়ীর প্রাকৃতিক পরিবেশ, তার গা-ছমছম-করা নির্জনতা, তার পটভূমির রুক্ষ বন্য সৌন্দর্য তাঁর কবিমনকে আকৃষ্ট করেছে বেশি করে। কবির লেখনীর পক্ষে নীরস ইতিহাস রচনা করা শক্ত। তাই ইতিহাস হয়ে যায় ফ্যান্টাসী। তার কিছু উদাহরণ দেবার লোভ সম্বরণ করা শক্ত।

'ছায়া আর ছায়া নেই। সামনে দাঁড়িয়ে এক সৌম্য প্রাজ্ঞ ঋষি। মুখমণ্ডলে যুগযুগান্তরের জ্যোতি। সহাস্যে বলছেন :

...আমি ইতিহাস। অতীতকে আত্মস্থ করে ভবিষ্যতের ধ্যানে বসে থাকি আমি চিরবর্তমান। তোমারই অনুসন্ধিৎসার সাগ্রহ আহ্বানে তোমাকে নিয়ে এলাম এই তীর্থপ্রাঙ্গণে। দুর্গপ্রাঙ্গণ তোমার সঙ্গে কথা বলবে, গড়খাই তোমার সঙ্গে আলাপ করবে, অতীত ইতিহাসের অনেক কুশীলব স্ব স্ব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাদের জীবননাট্যের পুনরাভিনয় করবে তোমারই সমক্ষে। শোনো তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখ বেদনা যন্ত্রণার সংলাপ, শোনো তাদের জয়োল্লাস বা হতাশামথিত

দীর্ঘশ্বাস! কতো কোলাহল, কতো রণহুংকার, কতো বিলাপধ্বনি।'

এই পটভূমিতে তার পর এসেছে ইতিহাসের নারী ও পুরুষেরা একে একে কালানুসারে, যাদের সঙ্গে কিছুমাত্র সম্বন্ধ আছে তেলিয়াগড়ীর। লেখক শুধুমাত্র নীরস সাল তারিখ না খুঁজে খুঁজেছেন সেই সাল তারিখের মানুষদের যারা সৃষ্টি করেছিল ইতিহাস। চেষ্টা করেছেন তাদের মনগুলোকে ছুঁতে। বৌদ্ধযুগ থেকে সুরু করে আলীবর্দি খাঁর আমল পর্যন্ত তেলিয়াগড়ীর জীবনকাহিনী রচনা করেছেন সুন্দর ঝরঝরে ভাষায় সাবলীল ভঙ্গীতে। নীরস ইতিহাস পড়ার বিরক্তি নেই অথচ তেলিয়াগড়ী সম্বন্ধে পরিষ্কার একটা ধারণা গড়ে ওঠে পাঠকের মনে। অন্তরে আঁকা হয়ে যায় তাৎকালিক কিছু কিছু খণ্ডচিত্র। যা সুন্দর, কিছুটা বিষণ্ণ।

কট্টর ইতিহাসবেত্তারা এ ধরণের লেখাকে হয়ত ইতিহাস বলে মানতে চাইবেন না। বলবেন ইতিহাসে কল্পনার ভেজাল মিশে এটা সাধারণ রম্যরচনার পর্যায়ে পড়ে গেছে। তা যাক্। সবাই তো আর বসে বসে একটানা নীরস ইতিহাস পড়তে পারে না। ভালো লাগে না। কিন্তু তেলিয়াগড়ীর প্রাঙ্গণের মত বই একসঙ্গে একটানা বসে প্রায় সবাই পড়ে ফেলতে পারে এবং সেইসঙ্গে নিজের অজান্তে জেনে যায় কিছু ইতিহাস। সাধারণ পাঠককে ইতিহাস মনস্ক করে তোলার এ একটি সুন্দর উপায়। লেখককে আমার অনুরোধ এরকম আরো কিছু রচনা উনি সৃষ্টি করুন।

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা মানানসই। মুদ্রণ ব্যাপারে কিছু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন ছিল।

প্রকাশ পাল